মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

জুন ২০২৬
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩
যুলহিজ্জাহ-১৪৪৭ মুহাররম ১৪৪৮
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৯

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন ॥ ৫
দারসুল হাদীস ॥ ১৩
চিন্তাধারা
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ॥ ২১
মতামত
বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের তত্ত্ব আসলে ধাপ্পাবাজি
আবুল আসাদ ॥ ২৯
জীবনকথা
ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহ)
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৬
চিন্তাধারা
কালবের ব্যাধি ও তা দূরীকরণের গুরুত্ব
ড. আহমদ আলী ॥ ৪৪
হজ্জ ও নতুন জীবনের সূচনা
ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ॥ ৫১
আন্তর্জাতিক
হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা
মীযানুল করিম ॥ ৫৫
প্রশ্নোত্তর ॥ ৬০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

আশুরার প্রকৃত শিক্ষা

মুহাররম মাসের ১০ তারিখ, যাকে আশুরা বলা হয়, একটি ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে দু'টি ঘটনা ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। একটি হলো উদ্ধত জালিমের করুণ পরিণতি, আরেকটি হলো জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে মাজলুমের আত্মত্যাগ এবং জীবন দিয়ে সত্যের পাতাকা সমুন্নত রাখার উজ্জল আদর্শ।

ফেরাউন ছিলো একজন উদ্ধত ও জালিম শাসক। যুগ যুগ ধরে এ ক্ষমতাদর্পী শাসক বানী ইসরাঈলের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রেখেছে। এ অহংকারী শাসক দাবী করেছিল, "আমিই তোমাদের মহান প্রভু"! এ ক্ষমতাধর জালিম স্বৈরশাসককে আল্লাহ তা'আলা এদিনেই সলিল সমাধি করে চিরতরে নির্মূল করে তার জুলুমের নাগপাশ থেকে মূসা (আ) ও বানী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেই ক্ষান্ত হননি অধিকন্তু তার মৃতদেহকে অদ্যাবধি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। যাতে সে যুগে যুগে সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে যে, স্বৈরাচারী, দুর্বিনীত, জালিম শাসকদের পরিণতি কত ভয়াবহ ও করুণ হয়।

এদিনে আরেক জালেম স্বৈরশাসক নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর খলিল ইবরাহীম (আ) কে নিরাপদে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। এ ঘটনাগুলো থেকে অন্যায় ও স্বৈরাচারী জালিম শাসকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। বরং সময়ের ব্যবধানে তাদের পতন অনিবার্য এবং তাদেরকে এজন্য চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর আখিরাতেও তাদের জুলুম ও অন্যায়ের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে এবং কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। ন্যায় ও সত্যের পতাকাবাহী কাফেলার জন্যও এসকল ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো জুলুম, নির্যাতন, সংকট প্রভৃতি সাময়িক। এক সময় এগুলোর অবসান হবে এবং জালিমের ধ্বংসাবশেষের উপর সত্যের বিজয় কেতন উড়বে।

আশুরার আরেকটি ঘটনা হলো কারবালার মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা। এখানে সত্যের পতাকাবাহী মাজলুমের রক্তে জালিমের হাত রঞ্জিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) এর প্রিয় দৌহিত্র হোসাইন (রা) খিলাফতে রাশেদার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা ও সত্যের পাতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য সপরিবারে জীবন

কুরবানী করেছেন। জীবন দিয়েছেন কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথানত করেননি। তাতে যুদ্ধে হোসাইন (রা) এর পরাজয় হয়েছে। কিন্তু জয় হয়েছে সত্যের, জয় হয়েছে আদর্শের, জয় হয়েছে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদী দুর্বার চেতনার। যে চেতনা মজলুমকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়, আর জালিমের হৃদপিণ্ডে সৃষ্টি করে কাঁপন। যে চেতনা বন্ধুর পথ, বাঁধার পাহাড় মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়। যা একজন সত্য-ন্যায়ের পথিককে, একজন মুসলিমকে এ দৃপ্ত শপথে উদ্দীপ্ত করে– "জান দেগা, নেহি দেগা আমামা"। কারবালা ও ফোরাত শহীদদের রক্ত শোষে নি:শেষ করে দেয়নি, বরং তা প্রতিটি সত্যপন্থীর ধমনীতে প্রবাহিত করেছে, প্রাণ সঞ্চার করেছে মুসলিম ও ইসলামের। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন, "ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কি বাদ।"

কারবালার মূল শিক্ষা হলো, শত ঝড়-ঝাঞ্ঝার মধ্যেও সত্যের পথে অবিচল থাকা, প্রয়োজনে সে জন্য জীবন দেওয়া, তবুও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা। সত্যের জন্য, দ্বীনের জন্য যারা জীবন দেয়, আল কুরআনের ভাষায় তারা অমর। তাদের জীবন দান কখনো বৃথা যায় না। বরং তারা চিরভাস্বর, চির অম্লান, মানুষের মনে চিরজাগ্রত। আল্লাহর নিকটও তাদের মর্যাদা সমুন্নত। মনে রাখতে হবে,

জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি/শহীদী রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানী

সুতরাং আশুরা মাতম আর বুক চাপড়িয়ে হায় হোসেন! হায় হোসেন! করার দিন নয়। বরং আশুরা অন্যায়, জুলুম, সন্ত্রাস ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দিন। বিশেষ করে বর্তমানে যখন গোটা বিশ্বের মুসলিমগণ এবং দুর্বল ও অসহায় জনগণ জালিমের যাতাকলে পিষ্ট, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নখর থাবায় ক্ষতবিক্ষত, মানবতা যখন বিধ্বস্ত, তখন আশুরার শিক্ষাকে ধারণ করে মানবতার মুক্তির জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই প্রতিটি বিবেকবান মানুষ, বিশেষ করে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। কাজেই বুক চাপড়ানো নয় বরং আশুরার মূল শিক্ষা বুকে ধারণ করতে হবে। আর তা হলো- "ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা"। ■

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

অনুবাদ: 'আপনি বলুন! তিনি আল্লাহ, এক– অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই', [সূরা আল–ইখলাস– **১১২: ১– ৪**]।

নামকরণ: বিষয়বস্তুর বিবেচনায় সূরাটির নাম **الإِخْلَاص।** 'আল–ইখলাস' নামকরণ করা হয়েছে। এ শব্দটি সূরাটিতে উল্লেখ নেই। এর অর্থ নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধতা। 'আল– ইখলাস'কে তাওহীদও বলা হয়।

নাযিলের সময়কাল: 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ প্রমুখ বলেন, সূরাটি মাক্কায় অবতীর্ণ। ইবন 'আব্বাস (রা) এর আরেক উক্তি ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের মত অনুযায়ী এটি মাদানী সূরা, [তাফসীরুল কুরতুবী২০/২৪৪, ফাতহুল কাদীর ৫/৬৩১]। সূরাটি নাযিলের বিষয়ে উবাই ইবন কা'আব (রা) বলেন, মুশরিকগণ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর বংশ– পরিচয় বলুন। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাযিল করেন, [সুনানুত তিরমিযী ৫/৩০৮, নং ৩৩৬৪, মুসনাদ আহমাদ ৩৫/১৪৩, নং ২১২১৯, আল– মুস্তাদরাক ২/৫৮৯, নং ৩৯৮৭, হাদীসটি হাসান]।

বিষয়বস্তু: সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা। এ সূরাটিতে সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতীব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

বৈশিষ্ট ও ফাযীলত: সূরাটির ফাযীলত ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে;

এক. 'আয়িশা (রা) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যেতেন তখন তিনি তার দু'হাতের তালু একত্রিত করতেন তারপর সেখানে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস', এ তিন সূরা পড়ে ফুঁ

দিতেন। তারপর এ দু'হাতের তালু দিয়ে তার শরীরের যতটুকু সম্ভব মসেহ করতেন। এ দু' হাত দ্বারা তার মাথা, তার চেহারা এবং তার শরীরের সম্মুখ অংশ থেকে শুরু করতেন। এমনটি তিনি তিনবার করতেন', [সাহীহুল বুখারী ৬/১৯০, নং ৫০১৭, আবু দাউদ ৪/৩১৩, নং ৫০৫৬]।

দুই. এ সূরাটি আল–কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে আল–কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা আল–ইখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, এই সূরাটি আল–কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান', [সাহীহ মুসলিম ১/৫৫৭, নং ৮১২, সুনানুত তিরমিযী ৫/১৯, নং ২৯০০]।

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল– বিকাল সূরা আল–ইখলাস, আল– ফালাক এবং আন– নাস পাঠ করে তা তাকে বিপদ– মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়', [সুনান আবি দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮২, সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৫৯, নং ৩৫৭৫, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

চার. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আগমন করলাম। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' পড়তে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ওয়াজিব হয়ে গেল'। আমি বললাম, কি ওয়াজিব হল? তিনি বললেন, 'জান্নাত', [সুনানুত তিরমিযী ৫/১৭, নং ২৮৯৭, মুসনাদ আহমাদ ১৩/৩৮৬, নং ৮০১১, ইমাম আত– তিরমিযী, হাসান সাহীহ বলেছেন, আলবানী সাহীহ বলেছেন।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহর বাণী, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 'আপনি বলুন'! এখানে আপনি বলুন বলে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ সম্পর্কে তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে যে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা প্রত্যেক মু'মিনকেই বলতে হবে, [তাফহীমুল কুরআন ১৯/৩০৭]। ব্যকরণিকভাবে هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ বাক্যটিকে কয়েক ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তবে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ হলো, هُوَ উদ্দেশ্য (Subject), اللَّهُ তার বিধেয় (Predicate) এবং أَحَدٌ তার দ্বিতীয় বিধেয়। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, একক। এ অর্থও হতে পারে, তিনি আল্লাহ এক, [আস্– সামীন আল– হালাবী, আদ্– দুররুল মাসূন ১১/১৪৯, ফাতহুল কাদীর ৫/৬৩৩, আর দেখুনঃ তাফহীমুল কুরআন১৯/৩০৯]। **'তিনি আল্লাহ, এক– অদ্বিতীয়'**। তাঁর কোন স্ত্রী, সন্তান, সদৃশ, সমকক্ষ, সমতুল্য ও অংশিদার কিছুই নেই, তিনি এসব কিছু থেকে পুতঃ পবিত্র। একত্ব তাঁরই মাঝে নিহিত। তাই তিনি পূর্ণতার একমাত্র অধিকারী, অদ্বিতীয় ও এক। সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণাগুণ এবং পবিত্র কর্মসমূহ এককভাবে শুধুমাত্র তাঁরই, [তাফসীরুল কুরতুবী ২০/২৪৪, শাইখ আস্– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৮৬৬]। আর **أَحَدٌ শব্দটি** শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্যই ব্যবহৃত। অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ প্রকাশ অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার হয়না, প্রযোজ্যও নয়। কেননা তিনিই গুণাবলী কার্যাবলীতে একমাত্র পরিপূর্ণ সত্তা, [তাফসীর ইবন কাসীর ৮/৫২৮]। মূল কথা

হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র কুরআন এবং সকল নাবী ও রাসূল আল্লাহর এই একত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই, সমগ্র সৃষ্টিজগতেই আল্লাহর একত্বের পরিচয় রয়েছে। আল- কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে, [আশ্- শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ৯/১৪৯]।

মহান আল্লাহর বাণী, اللَّهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী'। الصَّمَدُ শব্দটি **صَمْد** ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অনেকগুলো অর্থ আছে, যেমন; মনস্থ করা, ইচ্ছা করা, উন্নত স্থান, উচ্চ সমতল ছাদ, প্রত্যেক বস্তুর উঁচু অংশ ইত্যাদি। এ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের অনেক উক্তি আছে; আলী (রা) ও 'ইকরামাহ বলেন, আস্- 'সামাদ' হচ্ছেন এমন এক সত্তা, যাঁর কাছে সকলেই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আরযী পেশ করে থাকে। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদসহ কারো কারো মতে 'সামাদ' এমন নেতা, যার নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইবন 'আব্বাস (রা) এর মতে, যে নেতা তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার যাবতীয় গুণাবলীতে সম্পূর্ণ পূর্ণতার অধিকারী তিনি 'সামাদ'। আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন, 'সামাদ'- যিনি তার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলেও অবশিষ্ট থাকবেন। বা যিনি চিরঞ্জীব, ও সবকিছুর ধারক, যার কোন পতন নেই। রাবী' ইবন আনাস বলেন, যিনি জন্ম গ্রহণ করেননি এবং জন্ম দেননি। তাছাড়াও তাফসীরবিদগণ আরো ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলো সবই একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য হয়। যেমন যিনি খাবার খান না, পানীয় গ্রহণ করেন না। যার কোন উদর নেই। যিনি আলোকোজ্জ্বল ইত্যাদি। ইমাম ইবন জারীর, ইবন আবিল হাতিম, আল-বাইহাকী, আত্- তাবারানী প্রমুখ বিভিন্ন সনদে এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন, [দেখুনঃ ইবন জারীর, তাফসীরুত তাবারী ২৪/৭৮৭- ৬৯৩, তাফসীর ইবন কাসীর ৮/৫২৮- ৫২৯, তাফসীর ফাতহুল কাদীর ৫/৬৩৩- ৬৩৪, আদওয়াউল বায়ান ১/৪৭৪]। **الصَّمَدُ** শব্দের উপর্যুক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ও আসল 'আস্- সামাদ' হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ। সৃষ্টির পক্ষে এসব অর্থের কোন কোনটা প্রযোজ্য হলেও সৃষ্টি কখনো অবিনশ্বর নয়, তার বিনাশ ও ধ্বংস অনিবার্য এবং সৃষ্টি কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার কাছে কেউ মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজে আবার অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব থাকলেও তা নিরংকুশ নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন, সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সারা জাহানের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি 'আস্- সামাদ'। এমনই অমুখাপেক্ষী সত্তাই কেবল একক মা'বূদ ও ইলাহ হতে পারে। তিনিই মানুষের 'ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত। কারণ তিনিই সৃষ্টির সব প্রয়োজন পূরণ করেন। অপরদিকে যে প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না, [তাফহীমুল কুরআন ১৯/৩১০- ৩১৩]।

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি'। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহর কাছে আল্লাহর পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের প্রশ্নের উত্তর। কেননা স্ত্রী, সন্তান ও বংশ ইত্যাদি এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট, সৃষ্টিকর্তার নয়। মুশরিকগণ এবং তাদের মিত্রগণ মনে করে যে, মহিমান্বিত আল্লাহরও পরিবার আছে, তিনি

জন্ম দেন, তিনিও জন্ম নিয়েছেন। তাঁর জন্য তারা স্ত্রী, সন্তান বিশেষ করে কন্যা সন্তান আরোপ করে থাকে। আল– কুরআন ও আস্– সুন্নাতে তাদর এসব মিথ্যারোপের অনেক বাণী ও তথ্য বর্ণিত আছে। যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব উদ্ভট কথা তুলে ধরেছেন এবং কঠিনভাবে তাদের অপবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন ও নাকোচ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ}

'তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিভাবে? তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত', [আল–আন'আম– ৬: ১০১]। অর্থাৎ তিনিই তো সবকিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁরই সৃষ্টি থেকে সে তাঁর সমতুল্য কিভাবে হবে যে, সে তাঁর সমকক্ষ হবে বা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁরই সমান হবে? মহান আল্লাহ এসব কিছু থেকে অনেক উর্ধে ও পুত – পবিত্র, [তাফসীর ইবন কাসীর ৮/৫২৯]। মহান আল্লাহ আর বলেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}

'আর তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক জঘণ্য বিষয়ের অবতারণা করছ; যাতে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার, যমীন খণ্ড–বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হাওয়ার উপক্রম হবে, এ জন্যে যে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়! আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন, আর কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে', [মারইয়াম– ১৯: ৮৮– ৯৫]। আল্লাহ সুবাহনাহু বলেন,

{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}

'আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র! বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না। এবং তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ীই কাজ করে', [আল– আম্বিয়া– ২১: ২৬– ২৭]। আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে গণ্য করতো। আর মনে করতো যে, তারা আল্লাহর কাছে এসব মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করবে, [তাফসীরুল কুরতুবী ১১/২৮১, তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৩৩৮]। ফেরেশতাগণ আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে কথাও বলার সাহস রাখে না। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}

'আর তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জিনেরা জানে , নিশ্চয় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তারা যা আরোপ করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র', [আস্– সাফফাত– ৩৭: ১৫৮– ১৫৯]। মুজাহিদ বলেন, মুশরিকরা বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। তখন আবু বাকর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের জননী কে?

তারা বলল, ফেরেশতাদের মা হচ্ছে জিনদের নেতাদের কন্যাগণ, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৫/১৩৪, তাফসীর ইবন কাসীর ৭/৪২, সাহীহুল বুখারী ৪/১২৬]।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُؤًا أَحَدٌ

'আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যারোপ করে অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। আর আমাকে গালি দেয়, এটাও তার জন্য উচিত নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে, সে বলে আমাকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কোনভাবেই কঠিন নয়। আর আমাকে গালি দেয়ার ব্যাপারটি হলো, সে বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, আমি জন্মগ্রহণ করিনি এবং কাউকে জন্মও দেইনি। আর কেউ আমার সমকক্ষ নেই', [সাহীহুল বুখারী ৬/১৮০, নং ৪৯৭৪, ৪৯৭৫]। আবু মুসা আল্-আ'আরী বর্ণিত হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

'মন্দ কথা শোনার পর আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্য ও সহনশীল আর কেউ নেই, তারা তো তাঁর সন্তান আছে বলে দাবী করে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন' এবং তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন', [সাহীহুল বুখারী ৮/২৫, নং ৬০৯৯ম সাহীহ মুসলিম ৪/২১৬০, নং ২৮০৪]। অন্য আরেকটি হাদীসে আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ

'লোকেরা অনবরত পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেই থাকবে, এমনকি তারা বলবে, এই তো আল্লাহ! তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে'? [সাহীহুল বুখারী ৯/৯৬, নং ৭২৯৬, সাহীহ মুসলিম ১/১১৯, নং ১৩৪]। মহান আল্লাহ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তাদের এসব উদ্ভট কথা নাকচ করে দিয়েছেন এবং কঠিনভাবে প্রতিবাদ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

'তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু আছে যমীনে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না', [ইউনুস- ১০: ৬৮]। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দোষ-ত্রুটি মুক্ত। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে, এ কথা সঠিক হতে পারে না। মহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর স্ত্রী, সন্তান- সন্ততি, অংশীদার ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, [তাফসীরুল কুরতুবী ৮/৩৬১। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তো অভাবমুক্ত। সন্তান তো তারই প্রয়োজন, যার

অভাব আছে। আল্লাহ তা'আলা নিরংকুশ অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তাঁর সন্তানের কোন প্রয়োজনই নেই, [ফাতহুল কাদীর ২/৫২৩]। মহান আল্লাহ আর বলেন,

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا}

'বলুন! সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। আর আপনি তাঁর মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করুন', [বানু ইসরাঈল– ১৭: ১১১] বস্তুতঃ এ নির্দেশ রাসূলুল্লাহকে দেয়া হলেও এ নির্দেশটি সকল উম্মাতের জন্যই প্রযোজ্য। এ আয়াতে আল্লাহ সকলকে তাওহীদের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল–কুরআনের প্রচুর আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইভাবে আল্লাহর যেমন সন্তান নেই তেমনিভাবে আল্লাহর রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও রুবুবিয়্যাতেও কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তো অক্ষম নন। তাই তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই, [তাফসীরুল কুরতুবী ১০/ ৩৪৫, তাফসীর ইবন কাসীর ৫/১৩০]। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাঁকে গুনান্বিত করে তা থকে আল্লাহ কতইনা পবিত্র', [আল–মু'মিনুন– ২৩: ৯১]। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কর্তৃক তাঁর প্রতি সন্তান, স্ত্রী, অংশীদার ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে কঠিন যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। **মহান আল্লাহর বাণী, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই'**। আয়াতে উল্লেখিত **كُفُو** এর অর্থ হচ্ছে, সদৃশ, সমতুল্য, সমান ইত্যাদি। সে হিসেবে আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, বিশ্ব জগতে আল্লাহ সমতুল, সমকক্ষ ও সমমর্যাদা, গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান কেউ নেই। কেউ ছিলও না কেউ কোন দিন হতেও পারবে না এবং আকার আকৃতিতেও কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না, [তাফহীমুল কুরআন ১৯/৩১৬, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৪৮৩, সম্পাদনা মওঃ মহিউদ্দিন]। একটি হাদীসে এসেছে, বুরাইদাহ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং বলছে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

'হে আল্লা! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেনওনি এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, ব্যক্তিটি আল্লাহকে তাঁর এমন মহান নামে ডাকছে আর যার দ্বারা, দু'আ করলে তিনি কবুল করেন এবং যাঁর উসীলায় চাইলে তিনি প্রদান করেন। [সুনানা আবি দাউদ ২/৭৯, নং ১৪৯৩, সুনানুত তিরমিযী ৫/৩৯২, নং ৩৪৭৫, মুসনাদ আহমাদ ৩৮/৬৪, নং ২২৯৬৫, হাদীসটি সাহীহ]। এ অর্থে অন্য আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা', [আশ্– শুরা– ৪২: ১১]। অর্থাৎ তাঁর কোন সদৃশ বা তুলনা নেই। তঁর মত কোন কিছু নেই। তবে তিনি কিন্তু সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। অতএব তাঁর শোনার ও দেখার গুণাগুণ আছে, যেমনটি তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের জন্য সাজে। এরপরেও কেউ যদি তাঁর সাথে কোন কিছুর সদৃশ স্থাপন করে ও তুলনা করে, তাহলে সে কুফরী করে। ইমাম বুখারীর শাইখ না'ঈম ইবন হাম্মাদ আল–খুযা'য়ী বলেন,

مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে সদৃশ স্থাপন করে, সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায়। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ নিজেকে যে গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন তার অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফির হয়ে যায়', [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৪২৭]। ইমাম ইবন কাসীর বলেন,

وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَشْبِيهٌ، فَمَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ الصَّرِيحَةُ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَفَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى النَّقَائِصَ، فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى

আল্লাহ নিজেকে যে গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর রাসূল করেছেন, তাতে কোন সদৃশ স্থাপন নেই বা তুলনা সাব্যস্ত করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এমন গুণ দ্বারা গুণান্বিত করে, যা স্পষ্ট আয়াত এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ সব গুণ মহান আল্লাহর মহত্বের সাথে যেমনটি প্রযোজ্য হয় তেমনটি তাঁর জন্য প্রযোজ্য। একই সাথে আল্লাহর শানে সকল প্রকার ত্রুটি– বিচ্যুতি ও কমতিকে নিষিদ্ধ করে, সে ব্যক্তি সঠিক পথের উপরই চলছে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৪২৭, আশ্– শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ৩/১৯]। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, 'আমাদেরকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি তাঁর মর্মাথের সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেভাবেই ঈমান আনা আমাদের জন্য অপরিহার্য। সে গুণাগুণ তাঁর ক্ষেত্রে কেমন, কোন ধরনের তা অনুসন্ধান করা বা তা নিয়ে ভাবার কোন দায়িত্ব আমাদের নয়। কেননা পবিত্র মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এই ধরন ও কেমন সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, [আদওয়াউল বায়ান ৮/৫২৭]। উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথমাংশ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ দ্বারা মহিমান্বিত মহান আল্লাহ পরিবর্তনশীল ও প্রতিনিয়ত সংঘটিত নতুন নতুন বিষয়য়ের সাথে সদৃশ্য স্থাপন ও উপমা সাব্যস্ত করাকে নিজের সত্তা থেকে নিষিদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে আয়াতের শেষাংশ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ দ্বারা নিজের মহত্ব - বড়ত্বের ও পূর্ণতার গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, [আদওয়াউল বায়ান ২/১৮]। অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই উপমা

ও সদৃশ স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কোন সদৃশ স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না', [আন্– নাহ্‌ল– ১৬: ৭৪]। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত, সদৃশ ও উদাহরণ পেশ করো না। তিনি তো এক। সুতরাং তাঁর কোন উদাহরণ নেই। মুশরিকরা মনে করতো যে, মহান আল্লাহ এত বিশাল যে, তাঁর 'ইবাদাত আমাদের সাজে না। তাই দেব– দেবী, মূর্তি- প্রতিমা তারকারাজি ইত্যাদির মাধ্যমে এটা করতে হবে। যেমন সাধারণ মানুষ ছোট ছোট লোকেরা রাজা– বাদশার কাছে যেতে বড় বড় লোকদের মাধ্যমে যায়। এ আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে, [ফাতহুল কাদীর, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/১৪৩০]। একইভাবে মুশরিকরা মনে করে যে, রাজা– বাদশাদের কাছে কিছু পেতে হলে যেমন তাদের নিকটস্থ লোকদের মাধ্যমে যেতে হয়। আল্লাহ তা'আলার কাছেও কিছু পেতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি করতে হলে অনুরূপ নাবী– রাসূল, ফেরেশতা এবং আওলিয়া ও অন্যান্য সভাসদগণের মাধ্যমে যেতে হবে। তাদের সাহায্য ছাড়া আল্লাহর কাছে কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার নয়। এ আয়াতের মাধ্যমে এসব ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের মূল উৎপাটন করা হয়েছে, [আদওয়াউল বায়ান ২/৪১৮]।

উল্লেখ্য, রাজা-বাদশাদের কাছে যাওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কারণ রাজা-বাদশারা তাকে চেনে না এবং তার সম্পর্কে কিছু জানেও না। ফলে পরিচিত কারো মাধ্যমে যেতে হয়, যিনি তাকে তাদের কাছে পরিচায় করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর ইবাদাত করতে বা তার কাছে কিছু চাইতে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কেননা আল্লাহ সকলকে ভালভাবে চেনেন এবং জানেন। সুতরাং তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জ্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

শিক্ষাসমূহ:

এক. অতি অল্প কথায় আল্লাহর একত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ ও নিরংকুশ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এ সূরাটির আলোকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে নির্ভেজাল জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর প্রতি পরিশুদ্ধ ঈমান পোষণ করা এবং একত্ববাদের উপর অবিচল থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুই. সূরাটি আল্– কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান, এর মাধ্যমে সূরাটির মাহাত্ম ও বৈশিষ্ট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। সূরারি প্রকৃত শিক্ষা তাওহীদ। তাই খাঁটি নির্ভেজাল তাওহীদের উপর অবিচল থাকা মু'মিনদের অপরিহার্য।

তিন. সূরাটিতে আল্লাহর সাথে কারো দৃষ্টান্ত, উপমা, সদৃশ, তুলনা ইত্যাদি ধরনের চিন্তা– চেতনা ও কর্ম–কান্ড বলিষ্ঠভাবে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ তাওহীদ ও ঈমানের স্বার্থে তা সর্বদা মনে রাখা অপরিহার্য।

মহান দয়াময় আল্লাহ সকলকে উপর্যুক্ত শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

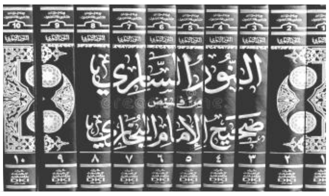

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ « الْمُتَكَبِّرُونَ ».

অনুবাদ

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম সে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে। আর তোমাদের মধ্যে ঐসব লোক আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থান হবে আমার নিকট থেকে অনেক দূরে। তারা হলো: বাচাল, ধৃষ্টতাপূর্ণ অশালীন উক্তিকারী এবং কথায় অহংকার প্রকাশকারী। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, আমরা তো আস-সারসারুনা (বাচাল) এবং আল-মুতাশাদ্দিকুনা (ধৃষ্টতাপূর্ণ অশালীন উক্তিকারী)-এর অর্থ বোঝলাম; কিন্তু আল-মুতাফাহিকুনা- এর অর্থ কী? তিনি বলেন, তারা হলো অহংকারীরা"।[১]

ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে নৈতিক ও অনৈতিক নামে দুটি সত্তা দান করেছেন। কারো মাঝে নৈতিক সত্তা উৎকর্ষ লাভ করলে সে মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পক্ষান্তরে কারো মাঝে অনৈতিক সত্তা প্রবল হলে তার মাঝে পাশবিকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সে নৈতিক দিক থেকে পতনের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। এই পথহারা জনগোষ্ঠীকে হেদায়াতদানের লক্ষে বিভিন্ন সময়ে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা সকলে যেমন সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তদ্রূপ তাঁরা মানবজাতিকে অনুপম চরিত্রের অধিকারী বানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য দারসুল হাদীসে উন্নত চরিত্রের অধিকারীর মর্যাদা এবং দুশ্চরিত্রের অধিকারীর ভয়াবহ পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং কীভাবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় এবং খারাপ চরিত্র থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সেবিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

---

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি 'আন রাসূলিল্লাহি স., বাব : মা জাআ ফী মা'আলিল আখলাক (বাব: ৭১), নং ২১০৩, হাদীসটির সনদসূত্র হাসান।

আলোচনার শুরুতে আমরা হুসনুল খুলুক (حسن الخلق) সম্পর্কে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো। এ পরিভাষাটি দুটি শব্দের সমন্বয় গঠিত।

হুসনুল খুলুক (حسن الخلق) আরবী শব্দ। এর অর্থ- উত্তম স্বভাব-চরিত্র, মার্জিত চরিত্র ইত্যাদি।

ইমাম আর-রাগিব ইসফাহানী বলেন, আল-খালকু (الخلق) ও আল-খুলুকু (الخلق) শব্দ দুটির মূল শব্দ এক ও অভিন্ন। আল-খাল্‌ক (الخلق) অর্থ- সৃষ্টি। এর দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর দৃশ্যমান কাঠামো বোঝায়। পক্ষান্তরে আল-খুলুক (الخلق) দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপ বোঝায়।

হুসনুল খুলুক (حسن الخلق) বলতে আসলে কী বোঝায়, সেবিষয়ে মনীষীগণ একাধিক অভিমত দিয়েছেন। যেমন-

আলী (রা) বলেন, "যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সে উত্তম স্বভাবের অধিকারী। সেগুলো হলো : হারাম কার্যাবলী থেকে বিরত থাকা; হালালের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকা এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা"।[২]

আল-হাসান (র) বলেন, হুসনুল খুলুক (حسن الخلق) বলতে বোঝায় "চেহারায় উচ্ছ্বলতা থাকা, মুক্তহস্তে দান করা ও আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকা"।[৩]

ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) বলেন, "মানুষ যেসব উত্তম কথা বলে ও উত্তম কাজ করে তা-ই হুসনুল খুলুক"।[৪]

ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, "নবী (স) তাকওয়া ও হুসনুল খুলুক একত্র করে বলেছেন, তাকওয়ার সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার সাথে আর হুসনুল খুলুক-এর সম্পর্ক বলতে এক বান্দার সাথে অপর বান্দার সম্পর্ক বোঝায়। এর ফলে ব্যক্তি একই সাথে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার প্রিয়ভাজন হয়ে যায়"।[৫]

মানুষের সাথে কথা ও কাজের আচরণিক দিক মার্জিত হলে তাকে উত্তম স্বভাব-চরিত্র বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا .

"এবং তোমরা মানুষের সাথে সদালাপ করবে"।[৬]

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ .

"যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম"।[৭]

মানবসৃষ্টির পেছনে বিশেষত তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যেমন- (১) ইবাদাত (একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব) করা, জীবনের সকল পর্যায়ে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মেনে চলা। এটাই মানবসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

---

২. ইমাম আল-গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তা.বি. খ. ৩, পৃ. ৫৭
৩. ইবন রাজাব হাম্বালী, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৬০
৪. ইবন তাইমিয়া, আল-আদাবুশ শারিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১০৪
৫. আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৭৫
৬. ২-সূরা আল-বাকারা, ৮৩
৭. ১৩-সূরা আর-রা'দ, ২২

"আর আমি জিন ও মানবজাতিকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেনো আমারই ইবাদাত করে"।[৮] (২) খিলাফতের দায়িত্ব পালন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .

"যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা (প্রতিনিধি) মনোনীত করেছি"।[৯] এবং (৩) ইমারাত (পৃথিবী আবাদ করা)।

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতেই তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন"।[১০]

এই তিনটি কাজ থেকে সফলতা পেতে ঈমানদার ব্যক্তিকে সবার আগে তার আত্মা পরিশুদ্ধ করতে হবে, অতঃপর সে দুনিয়া আবাদ করবে। এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সংকটের সমাধান খুঁজতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী প্রদর্শিত পথে, সৃষ্টির মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণার মাঝে নয়। এরপরই কেবল 'খুলুক' এর সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষকে আখলাক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সেই দেহ মৃততুল্য হয়ে যায়, তা প্রাণবন্ত থাকে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

"তারা প্রাণহীন, নির্জীব এবং তারা কখন পুনরুত্থিত হবে সেব্যাপারে তাদের কোনো চেতনা নেই"।[১১]

সুতরাং সৃষ্টি সত্যিকার জীবন পাবে আখলাকের মাঝে, দৃশ্যমান কাঠামোর মাঝে নয়। তাই তো মহানবী (স) আয়না দেখে পাঠ করতেন–

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي .

"হে আল্লাহ! তুমি আমার অবয়বকে যেমন সুন্দর কাঠামোয় সৃষ্টি করেছ তেমনি আমার আখলাককেও পরিশীলিত করো" (সহীহুল জামে)। এই দু'আর মাধ্যমে মহানবী (স) সৃষ্টি ও আখলাকের মাঝে একটি চমৎকার সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন।

বিশ্বব্যাপী আখলাকী সংকট উত্তরণের লক্ষে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং গবেষকগণও প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরপরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কেনো কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এবিষয়ে গভীর অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, এর মূলে নিহিত রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী-রাসূল প্রদর্শিত পথ থেকে সরে আসা। একটি হাদীস উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন-

مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيباً، وإن وضعت وضعت طيباً، وإن وقعت على عود نخراً لم تكسره .

---

৮. ৫১-সূরা আয-যারিয়াত, ৫৬
৯. ২-সূরা আল-বাকারা, ৩০
১০. ১১-সূরা হূদ, ৬১
১১. ১৬-সূরা আন-নাহল, ২১

"মুমিনের উদাহরণ মৌমাছির ন্যায়। সেটি উত্তম জিনিস খায় এবং উত্তম জিনিস উৎপাদন করে। সে কোথাও পড়ে গেলে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় না"।[১২]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, কর্মের জন্য কাউকে দোষারোপ না করে নিজেদের ভুল স্বীকার করা উচিত।

মুসলিমদের মাঝে প্রায়শ একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, নিজেদের অবক্ষয়ের জন্য তারা প্রতিপক্ষকে দায়ী করে। কিন্তু তারা নিজেরাই যে নিজেদের অজান্তে প্রতিপক্ষ হয়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ রাখে না। প্রতিপক্ষ তাদেরকেই বিধ্বস্ত করে,যারা নিজেদের মাঝে আত্মঘাতি উপাদান বহন করে। মুসলিমদের সেই আত্মঘাতি উপাদান হলো আখলাকি সংকট।

আখলাকি অবক্ষয় কোনো একক ঘটনা নয়। এটি সমাজের চিন্তা- বোধ-বিশ্বাস, ভাষা, মূল্যবোধ এবং আচরণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়া এক গভীর সাংস্কৃতিক ও মানসিক দূষণ। একে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার ভাবলে নিঃসন্দেহে তা ভুল হবে, এ দূষণ পুরো সভ্যতার মূল্যবোধ কাঠামোর ভাঙনের ফল। এই ভাঙনের মূলে কয়েকটি স্তর সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। যেমন-

(ক) প্রথম স্তর হলো সত্যের অবমূল্যায়ন। একটি সুস্থ নৈতিক সমাজে সত্য কেবল একটি তথ্য নয়। বরং সত্য একটি মূল্যবোধ, একটি প্রতিশ্রুতি এবং একটি নৈতিক দায়। সত্য বলা সাহস,সততা ও আত্মিক দৃঢ়তার প্রতীক। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সত্যের উৎকর্ষে অবনয়ন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এখানে মিথ্যাকে কৌশল বলা হয়। যেমন আমাদের সমাজের কিছু সংখ্যক এলিট অসত্য ও অপতথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তাকে রাজনৈতিক বক্তব্য (?) বলে চালিয়ে দেয়। মনে করা হয়, পরিস্থিতির দাবি পূরণ করতে গিয়ে সত্যকে আড়াল করা বা বিকৃত করাই বুদ্ধিমত্তা। ফলে সত্য আর নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে থাকে না, সত্য হয়ে ওঠে পরিস্থিতিনির্ভর বিকল্প। এহেন অবস্থায় আস্থার মিনার ধসে পড়ে। কারণ সত্যের ভিত্তি যেখানে নির্ভরযোগ্য নয়, সেখানে আখলাক তার কাঠামো নিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

(খ) দ্বিতীয় স্তর হলো স্বার্থপরতার আধিপত্য। আধুনিক সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে কায়েম রয়েছে 'আমি'। ব্যক্তি তার চিন্তা, সিদ্ধান্ত এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিজেকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর ফলে সামষ্টিক কল্যাণের গুরুত্ব হারাতে বসেছে। পরিবার, সমাজ এবং উম্মাহভিত্তিক নৈতিক কাঠামোর স্থান এখন ব্যক্তিগত সুবিধা, নিরাপত্তা এবং উন্নতি হয়ে ওঠেছে মূল বিষয়। ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তি ক্রমশ ঢিলেঢালা হতে শুরু করেছে।

(গ) তৃতীয় স্তর হলো নৈতিকতার আপেক্ষিকতা। এটি আধুনিক আখলাকি সংকটের একটি সূক্ষ্ম রূপ। এখানে কোনো ধরনের নৈতিক মানদণ্ড স্বীকার করা হয় না। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়,ভালো-মন্দ সবকিছুই পরিস্থিতি, সংস্কৃতি বা ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে নৈতিকতা তার সার্বজনীনতা হারায় এবং নৈতিকতার কোনো মজবুত ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

(ঘ) চতুর্থ স্তর হলো ক্ষমতা ও অর্থের পূজা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি নতুন মূল্যবোধের কাঠামো গড়ে উঠেছে, যেখানে সফলতা নৈতিকতার স্থান দখল করে নিয়েছে।

---

১২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, নং ১১২৭৮

আগে সফলতা নৈতিকতার অধীন ছিলো। অর্থাৎ সফল হতে হলে ন্যায়, সততা ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে হতো। কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতা সফলতার অধীন হয়ে গেছে। ফলে মানুষ এখন এমন এক মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেখানে নৈতিকতা প্রশ্ন নয়, বরং কার্যকারিতা ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচ্য বিষয়। ফলে নৈতিকতা তার স্থান হারায়। এমনতর বহু উপাদান আছে, যেগুলো এক হয়ে আখলাকি সংকট অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। ব্যাপারটি কয়েক দিক থেকে খোলাসা করা যেতে পারে। যেমন-

(ক) প্রথমত রূহানী শূন্যতা। এটি ব্যক্তি, সমষ্টি এক কথায় আখলাকি পতনের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী কারণ। মানুষের নৈতিকতা কেবল সামাজিক নিয়ম বা আইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং এর একটি অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকে, যা মানুষকে উচ্চতর মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত করে। ইসলামী সভ্যতায় এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক দুর্বল হলে নৈতিকতা তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারায়। এর ফলে নৈতিকতার ভিত ধসে পড়ে।

(খ) দ্বিতীয়ত জ্ঞান ও আমলের মধ্যকার ফারাক আখলাকি সংকটকে আরো গভীর করে তোলে। জ্ঞান কখনো সভ্যতা বিনির্মাণ করে না, যদি তা জীবন্ত বাস্তবতায় রূপান্তরিত না হয়। জ্ঞান কেবল নিছক পাঠ্য বা তথ্য নয়। জ্ঞান একটি শক্তি, যা মানুষের আচরণ, চরিত্র এবং সামাজিক কাঠামোকে রূপ দেয়। তবে জ্ঞান ও আমলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে জ্ঞান তার কার্যকারিতা হারায়। ফলে জ্ঞান নিছক আনুষ্ঠানিক ও নিষ্ক্রিয় কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে, যা আচরণ বদলায় না। এই বিচ্ছিন্নতা সমাজে এক ধরনের দ্বৈধতা সৃষ্টি করে। মানুষ জানে কোনটি সঠিক, কিন্তু সে করে সেটিই যা সুবিধাজনক। এই দ্বৈধতাই নৈতিকতার ভেতরকার সত্যনিষ্ঠা ধ্বংস করে দেয়।

(গ) তৃতীয়ত পশ্চিমা ভোগবাদী চিন্তার প্রভাব আখলাকি সংকটকে আরো ঘনীভূত করে দেয়। পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে নিছক ভোগবাদী সত্তা হিসেবে দেখতে চায়। এই চিন্তাধারা যখন কোনো সমাজে প্রবেশ করে, তখন সেই সমাজের মানুষের মূল্যবোধ পাল্টে দেয়। তারাও মনে করতে শুরু করে, সফলতা মানে ভোগ, ক্ষমতা ও আরাম-আয়াশ। ফলে মানুষের মাঝে আকাঙ্ক্ষা দানবীয় রূপ ধারণ করে এবং নৈতিকতার ভিত ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে।

(ঘ) চতুর্থত আদর্শ ব্যক্তিত্বের সংকট আখলাকি অবক্ষয়ের দৃশ্যমান ও বাস্তব দিক। একটি সভ্যতা তখনই নৈতিকভাবে মজবুত থাকে যখন সেখানে ধারাবাহিকভাবে এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, যারা কেবল আলিম (জ্ঞানী সম্প্রদায়) নয়, বরং চরিত্রবান, দায়িত্বশীল এবং নৈতিকভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক। এই ধরণের লোক সমাজে রোলমডেল হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দেয়। এই ধরনের লোকের অভাব দেখা দিলে সমাজে নৈতিক অনুপ্রেরণায় শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো সভ্যতা কেবল স্থাপত্য, অর্থনীতি বা রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর টিকে থাকে না, বরং তার প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ভর করে এমন সব মানুষের ওপর, যে নিজেকে একটি ঐতিহাসিক ও নৈতিক মিশনের ধারক হিসেবে উপলব্ধি করে। কিন্তু যখন এই চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন জন্ম নেয় এক বিশেষ অবস্থা।

আমাদের মাঝে একটি রোগ বাসা বেঁধেছে। তা হলো, অপরের কাঁধে দোষ চাপানো। কিন্তু নবী-রাসূলগণের কোনো কাজ তাঁদের নিকট অসংগত মনে হলে তার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে শোধরে নেয়ার চেষ্টা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আদম (আ) বলেছেন, "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা এবং দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো" (৭ : ২৩) এবং ইউনুস (আ) বলেছেন, "আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী" (২১ : ৮৭)।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে আখলাকে নববীর দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী (স) সম্পর্কে বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে"।[১৩]

আর মহানবী (স) তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন-

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

" আমি মহত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি" (আহমাদ, হাকিম)।

প্রশ্ন হচ্ছে, যারা সমাজে দীনদার হিসেবে পরিচিত, তাদের মধ্যেও কেনো একটি প্রত্যাশিত সংখ্যক আখলাক সম্পন্ন লোক দেখা যাচ্ছে না। মসজিদে ও ওয়াযের ময়দানে তাদের আখলাক একরকম আবার পরিবারের চিত্র অন্য রকম। কখনো কখনো শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি উঁচু মানের পরহেযগার, কিন্তু তার ব্যাপারে একথা কম-ই শোনা যায় যে, সে একজন আদর্শবান স্বামী অথবা আদর্শবান পিতা অথবা একজন আদর্শবান প্রতিবেশী।

মহানবী (স) বিশ্ববাসীর জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। কুরআন তাঁর অনুপম চরিত্রের রূপরেখা। তাঁর আখলাক ছিলো আল কুরআনেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনধারা পর্যালোচনা করলে আখলাকের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

" আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত"।[১৪]

সচ্চরিত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী (স) বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ « تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ « الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন আমল অধিক সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি

১৩. ৩৩-সূরা আল-আহযাব, ২১
১৪. ৬৮-সূরা আল-কলম, ৪

ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, জিহ্বা ও লজ্জাস্থান"।[১৫]

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ –ﷺ– قَالَ « مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ .

আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির ওজনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের তুলনায় অপর কোনো বস্তু অধিক ওজনদার হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন"।[১৬]

দুশ্চরিত্রবান লোক সমাজের জন্য বোঝা। নিম্নোক্ত হাদীসে তাদের উপমা দেয়া হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِى مُوسَى – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – « مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً . »

আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সৎসংগী ও অসৎসংগীর উপমা হলো সুগন্ধি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। সুগন্ধি বিক্রেতা তোমাকে বঞ্চিত করবে না, হয় তুমি তা কিনবে অথবা তার ঘ্রাণ পাবে। কিন্তু কর্মকারের হাপর হয় তোমার শরীর বা কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তুমি এর দুর্গন্ধ পাবে"।[১৭]

মন্দ স্বভাবের লোকদের যে তিনটি বৈষ্ট্যের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো হলো, বাচাল, অশালীন উক্তিকারী এবং কথায় অহংকার প্রকাশকারী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতা বলা, অশালীন উক্তি করা এবং অহংকার প্রদর্শন কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত জাহান্নামী লোকের বৈশিষ্ট্য। এগুলো আত্মরক্ষা করে চলা সকল ঈমানদারের কর্তব্য।

শিক্ষা

১. উত্তম স্বভাব মানুষের বিশেষ গুণ
২. মানুষের মনের গভীরে স্থান করে নেয়ার মাধ্যম
৩. মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছার সোপান
৪. উত্তম স্বভাব-চরিত্র জান্নাত লাভের মাধ্যম
৫. জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকার অবলম্বন
৬. মানুষকে কাছে টানার অব্যর্থ উপায়
৭. মন্দ স্বভাব জাহান্নামে যাওয়ার কারণ
৮. মন্দ কাজ সংঘটিত হলে ভালো কাজ সম্পাদন করা কর্তব্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষা ধারণ করার তাওফীক দিন। আমীন। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

---

১৫. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাবঃ ৮২, নং ২১৩৫
১৬. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাবঃ ৮২, নং ২১৩৩
১৭. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাবঃ ৩৮, নং ২১০১

২০ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই মূলনীতি যে, আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর রয়েছে, আর কারো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন চলবেনা, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা, এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।" [সূরা ইউসুফ: ৪০]

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ –

"তারা জিজ্ঞাসা করে, ক্ষমতায় আমাদের কিছু অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর। [সূরা আলে ইমরান: ১৫৪]

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ –

"নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্তভাবে একথা বলোনা যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।" [সূরা আন্ নাহল: ১১৬]

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"আল্লাহর নাযিল করা শরীয়া মোতাবেক যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের।" [সূরা মায়েদা: ৪৪]

এ মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আইন রচনাকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। কোনো মানুষ, চাই নবীই হোকনা কেন, স্বতন্ত্রভাবে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার অধিকারী নয়। নবী নিজেও আল্লাহর আদেশেরই অনুগত।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ

"আমি শুধু ওহীযোগে প্রাপ্ত নির্দেশই মেনে চলি।" [সূরা আনয়াম: ৫০]

সাধারণ মানুষকে নবীর আনুগত্য করা নির্দেশ শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হুকুম নয় বরং আল্লাহর হুকুম জারী করেন।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ –

"আমি যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে- এজন্যই পাঠিয়েছি।" [সূরা আননিসা: ৬৪]

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ –

"এই সকল ব্যক্তিবর্গকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়্যত দান করেছি।" [সূরা আনয়াম: ৮৯]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۦنَ –

"কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করবেন আর সে জনগণকে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সে শুধু একথাই বলবে যে, তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।" [সূরা আল ইমরান: ৭৯]

সুতরাং কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কয়টি প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

১. কোনো ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠী এমনকি রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠী মিলিত হয়েও সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ তায়ালা। বাদবাকী সবাই নিছক প্রজার মর্যাদা রাখে।

২. আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। সকল মুসলমান মিলিত হয়ে না পারে নিজেদের জন্য কোনো আইন বানাতে, আর না পারে আল্লাহর প্রণীত কোনো আইন সংশোধন করতে।

৩. আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার শুধুমাত্র আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী সরকার হিসেবেই এবং যতক্ষণ আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে থাকবে ততক্ষণই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে।

যে কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি একটি নজর বুলিয়েই বুঝতে পারে যে, এটা পাশ্চাত্য ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র [Secular Democracy] নয়। কেননা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রতো বলাই হয় এমন শাসন ব্যবস্থাকে, যাতে দেশের সাধারণ অধিবাসীদের সার্বভৌমত্ব থাকে, তাদের মতেই দেশের আইন তৈরী হয় এবং তাদের মতানুসারেই আইনের সংশোধন ও রদবদল হয়ে থাকে। যে আইন তারা চাইবে তা চালু আর যে আইন তারা চাইবেনা তাকে আইনের বই থেকে খারিজ করে দেয়া হবে। ইসলামে একথা খাটেনা। এখানে একটা সর্বোচ্চ মৌলিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের মাধ্যমে দেন, যার আনুগত্য সরকার ও রাষ্ট্রকে করতেই হয়। সুতরাং এ অর্থে তাকে গণতন্ত্র বলা যায়না। এর জন্য অধিকতর নির্ভুল নাম হচ্ছে "খোদায়ী শাসন" যাকে ইংরেজীতে [Theocracy] বলা হয়ে থাকে। তবে ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্র্যাসী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, তাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী [Priest class] আল্লাহর নামে নিজেদের বানানো আইনকুনুন চালু করে। [খৃষ্টান পোপ ও পাদ্রীদের কাছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কিছুসংখ্যক নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শরী'আত তথা আইন বিধান আদৌ ছিলোনা। তাই তারা নিজেদের ইচ্ছামতো আপন প্রবৃত্তির খায়েশ মোতাবেক আইন বানাতো আর তাকে আল্লাহর আইন আখ্যায়িত করে বাস্তবায়িত করতো। সূরা বাকারার ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ –

"যারা নিজ হাতে বই লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণাম।"]

এভাবে তারা কার্যত জনসাধারণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়। এধরনের শাসনকে খোদায়ী শাসন বলার চেয়ে শয়তানী শাসন বলাই অধিকতর মানান সই। পক্ষান্তরে ইসলাম যে থিওক্র্যাসী পেশ করে, তা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং সাধারণ মুসলমানদের হাতে নিবদ্ধ থাকে। আর এই সাধারণ মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে তা পরিচালনা করে। আমাকে যদি একটা নতুন পরিভাষা উদ্ভাবনের অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমি এই শাসন ব্যবস্থাকে "ইসলামী গণশাসন" নামে অভিহিত করবো। কেননা এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন মুসলমানদেরকে একটা সীমিত গণসার্বভৌমত্ব [Limited popular sovereignty] দেয়া হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ [Executive] ও আইনসভা [Legrslature] মুসলিম জনগণের মতানুসারে গঠিত হবে। মুসলিম জনগণই এই দুটিকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারী হবে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আল্লাহর শরী'আতে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তা মুসলিম জনগণের ঐক্যমতেই নিষ্পন্ন হবে। আল্লাহর আইন যেখানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে, সেখানে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রজন্ম নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে তার ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারী হবে। এদিক থেকে এটা গণতন্ত্র বটে। কিন্তু একটু আগেই যেমন বললাম, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অকাট্য নির্দেশ বিদ্যমান থাকবে, সেখানে মুসলমানদের কোনো নেতা, কোনো আইনসভা, কোনো মুজতাহিদ, কোনো আলেম, এমনকি সারা দুনিয়ার মুসলমানরাও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তথাপি তাদের উক্ত নির্দেশের এক চুল পরিমাণ সংশোধন করারও অধিকার নেই। এদিক থেকে এটা থিওক্র্যাসী বা ধর্মীয় শাসন।

সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে আমি এ ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই যে ইসলামে গণতন্ত্রের ওপর এসব বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি কি জন্য আরোপ করা হয়েছে এবং কি ধরনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। যারা আপত্তি তোলে, তারা বলতে পারে, এভাবে তো আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিবেক ও আত্মার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। অথচ আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তা, দেহ ও প্রাণের স্বাধীনতা দেয়। এর জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলা যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, সেটা মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত স্বাধীনতা হরণ করার জন্য নয়, বরং তা রক্ষা করার জন্যই রেখেছেন। মানুষকে বিপথগামী হওয়া ও নিজের পায়ে কুড়াল মারা থেকে রেহাই দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তাতে গণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু উক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা কারলে এই দাবীর সারবত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তারা সবাই স্বয়ং আইন প্রণয়নও করেনা, তা কার্যকারীও করেনা। কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারা বাধ্য হয়, যাতে ঐ ব্যক্তিবর্গ তাদের পক্ষ

থেকে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। যেহেতু সমাজ সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা, সততা ও আমানতদারীর মতো অমুল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং এসব ধারণার তেমন কোনো গুরুত্বও স্বীকার করেনা, তাই যারা জনগণকে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ, চালাকী-চাতুরী ও মিথ্যা অপপ্রচার দ্বারা বোকা বানাতে পারে, তারাই এই নির্বাচনে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়। শুধু তাই নয়, তারা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে তাদের ইলাহ বা প্রভু হয়ে বসে। আর নির্বাচিত হয়ে তারা জনগণের উপকারার্থে নয়, বরং নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের তাগিদে আইন রচনা করে। অতঃপর জনগণের দেয়া ক্ষমতা বলেই এসব গণবিরোধী আইন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। আমেরিকাই বলুন, বৃটেনই বলুন কিংবা অন্য যেসব দেশ নিজেকে গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে মনে করে তাদের কথাই বলুন, সকল দেশেরই এই একই শোচনীয় দশা।

তারপর এদিকটা যদি উপেক্ষা করে মেনেও নিই যে, ওসব দেশে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনুসারেই আইন প্রণীত হয়ে থাকে, তথাপি অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভালো মন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারেনা। মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, নিজের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতার কিছু দিক সে উপলব্ধি করে এবং কিছু উপলব্ধি করতে পারেনা। এজন্য তার সিদ্ধান্ত সাধারণত একপেশে হয়ে থাকে। ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা তার ওপর এতো প্রবল হয়ে উঠে যে, সে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জ্ঞানগত ও যুক্তিসংগত উপায়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও মতামত খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অনেক সময় জ্ঞানগত ও যৌক্তিক দিক দিয়ে যে বিষয়টি তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকেও সে ভাবাবেগে ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার মোকাবিলায় অগ্রাহ্য করে। এর প্রমাণ হিসেবে বহু সংখ্যক উদাহরণ আমি দিতে পারি। তবে দীর্ঘ সূত্রিতা এড়ানোর জন্য আমি আমেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণ আইনের উদাহরণটি তুলে ধরবো। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তির আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিগুলোর ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং মানব সভ্যতার বিকৃতি ও বিপর্যয় আনয়ন করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন জনমত মদ নিষিদ্ধ করণের আইন পাশ করার পক্ষে সম্মতি দেয়। জনগণের সেই রায় অনুসারেই মার্কিন কংগ্রেস ১৯১৮ সালে এই আইন পাশ করে। কিন্তু আইনটি যখন কার্যকর হলো, তখন যে জনতার রায়ে তা পাশ হয়েছিলো তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তারা অবৈধভাবে আরো খারাপ মদ বানানো এবং পান করলো। আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মদ ব্যবহৃত হলো, অপরাধ আরো বৃদ্ধি পেলো। অবশেষে যে জনতার ভোটে মদ একদিন হারাম হয়েছিলো, তাদের ভোটেই পুনরায় তাকে হালাল করা হলো। ১৯৩৩ সালে মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে এই হারাম হওয়ার ফতোয়াটি যে হালাল হওয়ার ফতোয়ায় পরিবর্তিত হয়ে গেলো, তার কারণ এ ছিলোনা যে, তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে তখন মদ খাওয়া উপকারী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। বরং এর একমাত্র কারণ এই ছিলো যে, জনগণ তাদের জাহেলী প্রবৃত্তির

লালসার গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তারা তাদের সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিলো, আপন কামনা-বাসনাকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো এবং এই খোদার গোলামী করতে গিয়ে তারা যে আইনকে একদিন তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে সঠিক মনে করেছিলো, তাকে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিলো। এধরনের আরো বহু নজীর রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার নিজের জন্য আইন প্রণেতা [Legislature] হবার পুরোপরি যোগ্যতা রাখেনা। সে অন্যান্য প্রভুর গোলামী থেকে রেহাই পেলেও নিজের অবৈধ খায়েশের গোলাম হয়ে যাবে এবং নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানকে খোদা বানিয়ে নেবে। সুতরাং তার নিজ স্বার্থেই তার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত সীমারেখা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এগুলোকে ইসলামী পরিভাষায় "হুদুদুল্লাহ" তথা আল্লাহর সীমারেখা [Divine Limits] বলা হয়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কতিপয় মূলনীতি, বিধি ও অকাট্য নির্দেশাবলীর সমন্বয়ে রচিত এই বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারসাম্য ও সুষমতা বজায় রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছি। এগুলো দ্বরা মানুষের স্বাধীনতার শেষ সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই সীমারেখার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের আচরণের জন্য প্রাসংগিক বিধি প্রণয়ন করে নিতে পারো। কিন্তু তোমাদের এই সীমা লংঘন করার অনুমতি নেই। এই সীমা অতিক্রম করলে তোমাদের জীবন বিপর্যয় ও বিকৃতির শিকার হয়ে যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কথাই ধরুন। এতে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে, যাকাত ফরয করে, সূদকে হারাম করে, জুয়াকে নিষিদ্ধ করে, উত্তরাধিকারের আইন জারী করে এবং সম্পদ উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কয়েকটি সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানুষ যদি এই সীমান্ত চিহ্নগুলো ঠিক রাখে এবং এগুলোর আওতাধীন থেকে লেনদেন ও কায়কারবার সংগঠিত করে, তাহলে একদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতাও বহাল থাকবে, অপরদিকে শ্রেণী সংগ্রাম এবং এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর আধিপত্যের সেই পরিবেশও সৃষ্টি হতে পারেনা, যা শোষণ-নিপীড়নমূলক পুঁজিবাদ থেকে শুরু হয়ে শ্রমিকদের একনায়কত্বে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে পারিবারিক জীবনে আল্লাহ তা'আলা শরী'আত সম্মত পর্দা, পুরুষের আধিপত্য, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ও পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্য, তালাক ও খুলার বিধান, শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদজনিত শাস্তির বিধান দিয়ে এমন সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, মানুষ যদি এই সীমানা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে এবং এর গন্ডীর মধ্যে অবস্থান করে নিজের ঘরোয়া জীবনকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলে, তাহলে গৃহ যেমন যুলুম নির্যাতনের নিগড়ে পরিণত হবেনা, তেমনি যে লাগামহীন নারী স্বাধীনতার উদ্দাম পৈশাচিক বন্যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে তাও সেখান থেকে ফুটে বেরুবেনা।

অনুরূপভাবে মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ কিসাসের [হত্যার দায়ে প্রাণদন্ড] আইন, চুরির দায়ে হাত কাটা, মদের নিষিদ্ধ হওয়া, শারীরিক সতর ঢাকার সীমা

এবং এধরনের কয়েকটি স্থায়ী বিধি নির্ধারণ করার মাধ্যমে বিকৃতির দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন।
আল্লাহর এসব সীমা নির্ধারণী বিধিসমূহের একটা পূর্ণাংগ তালিকা পেশ করা এবং তার প্রত্যেকটি বিধি যে মানব জীবনে ভারসাম্য ও সুষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কতো জরুরী তা এখানে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। এখানে আমি শুধু এতোটুকু কথা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করতে চাই যে, আল্লাহ এভাবে এমন একটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান মানুষকে দিয়েছেন, যা তার স্বাধীনতার প্রাণশক্তিকে এবং তার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়না। বরং তার জন্য একটা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে সে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা বশত পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়। তার শক্তি ও প্রতিভাগুলো ভুল পথে অপব্যয়ের শিকার হয়ে বিনষ্ট না হয়, বরং সে যেনো নিজের সত্যিকার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে সোজাসুজিভাবে এগিয়ে যেতে পারে। পাঠক, আপনার যদি কখনো দুর্গম পার্বত্য পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, পেঁচানো পার্বত্য পথের একদিকে গভীর খাদ এবং অপরদিকে উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দাঁড়ানো থাকে। আর সেই পথের দুই কিনারকে এমনসব প্রতিবন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় যাতে পথিক খাদের দিকে চলে যেতে না পারে। এসব প্রতিবন্ধক স্থাপনের উদ্দেশ্য কি পথিকের স্বাধীনতা হরণ করা? না, তা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু তাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা এবং প্রত্যেক মোড়ে ও প্রত্যেক সম্ভাব্য শংকার সময় তাকে বলে দেয়া যে, তোমার পথ ওদিকে নয় এদিকে। তোমাকে ওদিকে নয় এদিকে মোড় ঘুরতে হবে, যাতে তুমি নিরাপদে আপন মানযিলে মাকসুদে পৌছে যেতে পারো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সংবিধানে যে কড়াকড়ি বিধি আরোপ করেছেন, তা উদ্দেশ্যও এটাই। এসব সীমারেখা মানুষের জীবন পথে পরিভ্রমণের সঠিক দিক নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক বিপদজ্জনক মোড়ে তাকে জানিয়ে দেয় যে, শান্তি ও নিরাপত্তার পথ এদিকে এবং তোমাকে ওদিকে নয় বরং এদিকে যেতে হবে।
আল্লাহর রচিত ও সংবিধান অপরিবর্তনীয়। আপনি ইচ্ছা করলে অন্যান্য পাশ্চাত্যভুক্ত মুসলিম দেশের ন্যায় সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, কিন্তু তাকে বদলাতে পারবেননা। এটা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান। ইসলামী রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এ সংবিধানের ভিত্তিতেই হবে। যতদিন কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ পৃথিবীতে বহাল থাকবে, ততদিন এ সংবিধানের একটি ধারাকেও স্থানান্তরিত করা যাবেনা। যে মুসলমান থাকতে চাইবে তাকে এর অনুসরণ করতেই হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

এ সংবিধানের আওতায় যে রাষ্ট্র গঠিত হবে, তার জন্য একটা লক্ষ্যও আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কুরআনের একাধিক স্থানে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ –

"আমি রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি আর তাদের সাথে কিতাব এবং মানদন্ড দিয়েছি, যাতে লোকেরা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি লোহা নাযিল করেছি, এতে প্রচন্ড শক্তি এবং জনগণের জন্য উপকারিতা রয়েছে।" [সূরা হাদীদ: ২৫]

এ আয়াতে লোহা দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি বা প্রয়োগ ক্ষমতাকে [Coercive power] বুঝানো হয়েছে। আর রসূলের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে যে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দিয়েছেন এবং নিজের কিতাবে যে দাড়িপাল্লা অর্থাৎ যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন, সে অনুসারে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যত্র বলেছেন:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ

"তারাই এসইসব লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদশে দান করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" [সূরা আল হজ্জ: ৪১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

"মানব জাতির কল্যাণার্থে আবির্ভূত সর্বশ্রেষ্ট জাতি তোমরাই। সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখাই তোমাদের কাজ" [সূরা আলে 'ইমরান: ১১০]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ক. ইতিবাচক ও সর্বাত্মক কর্মকান্ড: উপরোক্ত আয়াত কয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায়, কুরআন যে রাষ্ট্রের ধারণা ও পরিকল্পনা পেশ করে তার উদ্দেশ্য নেতিবাচক [Negative] নয় বরং তার সামনে একটা ইতিবাচক [Positive] উদ্দেশ্য রয়েছে। তার লক্ষ্য শুধু মানুষের পারস্পরিক বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার প্রতিহত করা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও দেশকে বিদেশী আক্রমণ থেকে হিফাযত করা নয়; বরং আল্লাহর কিতাবে সামাজিক সুবিচারের যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করাও তার লক্ষ্য। আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীতে অন্যায় অনাচারের যতো রূপ ও ধরনের উল্লেখ করেছেন, তার উচ্ছেদ সাধন এবং যতো রকমের ন্যায় ও সৎ কাজের বিবরণ দিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এ কাজে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শক্তিও প্রয়োগ করা হবে। দাওয়াত ও প্রচারণার মাধ্যমেও কাজ চালানো হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপায় উপকরণও কাজে লাগানো হবে এবং দলীয় প্রভাব ও জনমতের চাপও প্রয়োগ করা হবে।

এ ধরনের রাষ্ট্র যে স্বীয় তৎপরতা ও কর্মকান্ডের গন্ডীকে সীমিত করতে পারেনা তা সহজেই বুঝা যায়। এটা একটা বহুমুখী ও সর্বাত্মক রাষ্ট্র। গোটা মানবজীবনই এর কর্মক্ষেত্র। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগকে সে নিজের স্বতন্ত্র নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সংস্কারমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে চায়। এখানে কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো বিষয়কে ব্যক্তিগত বিষয় বলতে পারেনা, এদিক থেকে এই রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট ও

একনায়ক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে এক ধরনের সাদৃশ্যের দাবীদার বটে। তবে আর একটু অগ্রসর হয়ে পাঠক দেখতে পাবেন যে, এহেন সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও ইসলামী রাষ্ট্র এযুগের নিরংকুশ আধিপত্যবাদী [Totalitarian] ও [Authoritarian] সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র সমূহের মতো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেনা, একনায়কত্ব [Dictatorship] চাপিয়ে দেয়না। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং হক ও বাতিলের মাঝে যে নাযুক ও সুক্ষ্ম সীমান্ত প্রাচীর স্থাপন করেছে তা দেখে একজন সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের বিবেক স্বতস্ফুর্তভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন প্রকৃতপক্ষে মহাবিজ্ঞানী ও সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

খ. দলীয় ও আদর্শবাদী রাষ্ট্রঃ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমূখী চরিত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আপনা আপনিই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ রাষ্ট্র শুধু তারাই চালাতে পারে যারা এর শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী, যারা এর উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা এর সংস্কারবাদী কর্মসূচীর সাথে পুরোপুরি একমত, যারা এর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীলই শুধু নয় বরং এর প্রাণশক্তিকে ভালোভাবে হৃদয়ংগমও করে এবং এর খুঁটিনাটিও জানে। ইসলাম এক্ষেত্রে কোনো ভৌগলিক, বর্ণগত ও ভাষাগত বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। সে নিজের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমুখী কর্মসূচীকে সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে। যে ব্যক্তি তা মেনে নেবে, চাই সে যে কোনো বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, সে এই রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দলে প্রবেশ করতে পারে। আর যে তা গ্রহণ করবেনা তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পৃক্ত করা চলবেনা। তবে সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীন নাগরিক [Protecter Citizen] হিসেবে বসবাস করতে পারে। তার জন্য ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত রয়েছে। তবে তাকে সরকারে অংশীদারের মর্যাদা দেয়া হবেনা। কেননা এটা একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র যার প্রশাসনিক কাজ শুধু এর আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরাই চালাতে পারে।

এখানেও ইসলামী রাষ্ট্রে ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বিদের সাথে যে আচরণ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র করে থাকে, ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বিজয় অর্জন ও ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথেই আপন সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, হত্যা ও রক্তপাত চালানো এবং হাজার হাজার মানুষকে দুনিয়ার জাহান্নাম সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ার যে অব্যাহত ধারা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে শুরু হয়, ইসলামে সে সবের কোনো অস্তিত্ব নেই। ইসলাম স্বীয় রাষ্ট্রীয় সীমানায় অমুসলিমদের প্রতি যে উদার আচরণ করে থাকে এবং এ ব্যাপারে যুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের মাঝে যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেয়, তা দেখে যেকোনো ইনসাফ প্রিয় মানুষ এক নজরেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সংস্কারকগণ আসে, তারা কিভাবে কাজ করে। আর পৃথিবীতে যেসব স্বকথিত সংস্কারদের আবির্ভাব ঘটে তাদের কর্মপদ্ধতি কিরূপ হয়ে থাকে। ■

‘বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের তত্ত্ব আসলে ধাপ্পাবাজি’

আবুল আসাদ

প্রায় ৪০ বছর আগে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংগঠন ‘র’-এর ঘোষিত এজেন্ট কলকাতায় বসে কলকাতার বাংলা দৈনিক আজকালকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “বাংলাদেশের হিন্দুদের বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক অত্যাচার চালাক। যাতে তারা দলে দলে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে শুরু করে। শরণার্থীদের বোঝা বইতে হবে ভারত সরকারকে। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশে ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে কিছু অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।...... বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগুক, ব্যাপক হিন্দু নিধন হোক, যাতে এদেশের (ভারতের) সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সেন্টিমেন্টকে খুশি করার জন্য ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।” কালিদাস বৈদ্যের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দৈনিক আজকাল তার তিন সংখ্যায় ছাপে।[১]

কালিদাস বৈদ্যরা শান্তির দেশ, সহনশীল দেশ বাংলাদেশে তাদের চাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে পারেনি। কিংবা এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে পারেনি যাতে ব্যাপক হারে হিন্দুদের তারা ভারতে নিয়ে যেতে পারে। ফলে ভারতকে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে এখনো তারা সমর্থ হয়নি। এর বড় কারণ হলো, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চেয়ে বাংলাদেশের হিন্দুরাও অনেক সুখে শান্তিতে আছে। এটা আমার কথা নয়, বাস্তবতা এটাই। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের মাথাপিছু আয় এবং জনসংখ্যা অনুপাতে বাংলাদেশে হিন্দুদের চাকুরির খতিয়ান নিলেই তা বোঝা যাবে।

কালিদাস বৈদ্যদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর ওই একই লক্ষে বৈদ্য বাবুরা এবং ভারতে তাদের সহযোগীরা নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে এবং সেটা হল বাংলাদেশীদের ভারতে অনুপ্রবেশের স্লোগান। বাংলাদেশ থেকে ভারতে লক্ষ, কোটি সংখ্যায় অনুপ্রবেশের বায়বীয় সংখ্যা দেখানো হচ্ছে। ভারতের হিংস্র সংগঠনগুলোর কোয়ালিশন (যার মধ্যে ক্ষমতাসীন বিজিপিও রয়েছে) সংঘ পরিবার ভারতে বাংলাদেশীদের তথাকথিত অনুপ্রবেশ

---

১. ‘দৈনিক আজকাল’, কলকাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রঞ্জিত শুর, ২২, ২৩, ২৪ এপ্রিল ১৯৮৯

বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী গাঁজাখুরি সব তথ্য দিয়ে থাকে।[২] একটা অনলাইন মিডিয়ার উদ্ধৃত ২০০১ সালের আদমশুমারির বরাত দিয়ে বলেছে, ভারতে ৩০ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে। এর কিছু পরেই ২০০৭ সালে সরকারি এক পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে বলে, ভারতে আসা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ২ কোটি। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র স্টেট মিনিস্টার রামচন্দ্র বলেন, গত ডিকেডে (২০০১-২০১১) ১৪ লাখ বাংলাদেশী অবৈধভাবে ভারতে এসেছে। বাংলাদেশ থেকে তথাকথিত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা নিয়ে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে সংঘ পরিবারের বজরং দল। দলটি বলেছে, ভারতে তিন কোটি অবৈধ বাংলাদেশি বসবাস করছে। এদের নাকি ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে এবং ভোটার হিসাবে এরা নির্বাচনগুলোতে ভোটও দিয়েছে। এই প্রোপাগান্ডাটি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সহ কোন কোন রাজ্য সরকারেরও (যেমন আসাম) অংশ রয়েছে। ভারতের প্রতিটি নির্বাচনের আগে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ স্লোগানে সেখানকার আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং বাংলাদেশের সীমান্ত সন্নিহিত রাজ্যগুলোতে বিদেশি হওয়ার অজুহাতে লক্ষ লক্ষ লোককে ভারতীয় ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। এবারও সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অর্ধকোটিরও বেশি লোককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ অনুপ্রবেশের যে অংক দেখানো হয়, তা একদমই ভুয়া। একজন ভারতীয় মন্ত্রী লোকসভায় বলেছিলেন,....There has been a large scale influx of Bangladeshi nationals into India.... Do not appear to based on facts and are generally exaggerated.[৩]

অর্থাৎ 'বিরাট সংখ্যায় বাংলাদেশি মানুষ ভারতে ডুকছে এটা তথ্য নির্ভর নয় এবং সাধারণত এটা অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে।' অনেকদিন আগে যখন এক সময় বাংলাদেশ থেকে বিরাট সংখ্যায় অনুপ্রবেশ নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল, পশ্চিম বাংলা মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এমন কথাই বলেছিলেন। তার কথা ছিল, কাজ কিংবা সাংসারিক অন্য কোন প্রয়োজনে সীমান্তের এপারে-ওপারে যাতায়াত সব দেশেই আছে আমাদের দেশেও হয়। কাজ শেষে তারা ফিরে যায়। সংখ্যাটা কিছুটা বড় হলে তাদের ফিরিয়েও দেয়া হয়। যেমন ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে তথাকথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিবরণ দিতে গিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মন্ত্রী বিপিনি পাল দাস বলেন, ৪১ হাজার ৪৭৬ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।[৪]

১৯৮৩ সালের ২৭ এপ্রিল লোকসভার অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র সেথি অনুরূপ

---

২. 'Weekly Holiday', December, 1914 (https:/www.weeklyholiday.net/homepage /page/userhomeaspx)

৩. India Bangladesh Relations', Volume-V, Geetika Publishers, Naraina Vihar, New Delhi, Page. 2424.

৪. India Bangladesh Relations', Volume-V, Geetika Publishers, Naraina Vihar, New Delhi, Page. 2407.

বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী ২৭৭২৪ পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ২৪৩৪৭ ত্রিপুরা থেকে এবং ৫০০০ জনকে আসাম থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।[৫] পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ সময়ে তথাকথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নামে মোট ৩৪৩৯ কে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।[৬]

উপরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া, তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। এগুলোর সবটাই ভারতীয় বক্তব্য। ফেরত পাঠানো সবাই বাংলাদেশী নয়, বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক বিভিন্ন বক্তব্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ আবার তাদের পুশ ব্যাকও করেছে। দৃষ্টান্তগুলো এখানে নিয়ে আসলাম এই জন্যেই যে, ভারতে লক্ষ, কোটি বাংলাদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছে এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। দৃষ্টান্তগুলো প্রমাণ করছে, বাংলাদেশি দু'চারজন বা কিছু সংখ্যায় ভারতে অবৈধভাবে গিয়েও থাকে, ভারতীয় বক্তব্য অনুসারেই তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। ভারতে বসবাস করার মতো বাংলাদেশী কেউ ভারতে নেই। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা শুমারিও এই কথায় বলছে। শুভনীল চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ তাদের 'অনুপ্রবেশের তথ্য আসলে ধাপ্পাবাজি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন, "১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২% যা ২০০১ থেকে ২০১১ সালে কমে হয় ১০.৮%, একই সময়ে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৫.৯% থেকে কমে ২১.৮%। অর্থাৎ সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই সময়কালে হ্রাস পেয়েছে– হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩.৪ শতাংশ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৪.১ শতাংশ। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "যাঁরা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, তাঁদের মধ্যে যারা দুর্গাপূজা করেন তারা শরণার্থী, আর যারা করেন না তারা অনুপ্রবেশকারী। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী মানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে কোন তারতম্য দেখা যায়নি, বিপুল পরিমাণে অনুপ্রবেশকারী রাজ্যে প্রবেশ করলে যা ঘটতো।[৭]

কেউ হয়তো বলতে পারেন, বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ক্ষেত্রে লুকিয়ে আছে অনুপ্রবেশের তত্ত্বের প্রয়োজনীয় তথ্য। শুমারী রিপোর্ট থেকে বিষয়টা পরখ করে দেখা যেতে পারে। নিচে এ বিষয়ে একটা ছক দেওয়া হলোঃ

পশ্চিমবঙ্গের গড় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে জেলাভিত্তিক হারের তফাত,

---

৫. India Bangladesh Relations', Volume-V, Geetika Publishers, Naraina Vihar, New Delhi, Page. 2471.

৬. India Bangladesh Relations', Volume-V, Geetika Publishers, Naraina Vihar, New Delhi, Page. 2489.

৭. শুভনীল চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ দু'জনেই 'ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা-র অর্থনীতির শিক্ষক।

হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে (২০০১-২০১১)[৮]

জেলা	হিন্দু	মুসলমান	জেলা	হিন্দু	মুসলমান
দার্জিলিং	-০.৪	১.৩	উত্তর ২৪ পরগনা	-১.৪	-২.৪
জলপাইগুড়ি	০	০.৬	হুগলি	-২.৩	-৭.৮
কোচ বিহার	০.৭	-২	বাকুড়া	-১.৮	-০.৬
উত্তর দিনাজপুর	৬.৬	৮	পুরুলিয়া	১.৩	৪
দক্ষিণ দিনাজপুর	০	-৭.৫	মেদিনীপুর	৩.৫	৩.৫
মালদহ	৭.৩	৩.২	হাওড়া	-০.৫	-০.১
বীরভূম	১.৪	০.৯	কলকাতা	-১৪	-২১.৮
বর্ধমান	-০.৪	-৪.৫	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২.৫	-৪.৬
নদিয়া	-১	-৩.৭			

এই ছকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুভনীল চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ তাদের প্রবন্ধে লিখেছেন, "প্রথমে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির দিকে তাকানো যাক। দেখা যাচ্ছে যে, সেই জেলাগুলিতে (কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট একটি প্রবণতা নেই। একদিকে যেমন উত্তর দিনাজপুরে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজ্যের মুসলমানদের গড়ের তুলনায় ৮ শতাংশ কিছু বেশি, সেখানে নদিয়ায় তা প্রায় ৪ শতাংশ বিন্দু কম, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭.৫ শতাংশ বিন্দু কম। দ্বিতীয়ত: যে জেলায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার রাজ্য গড়ের তুলনায় বেশি, সেখানে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইত্যাদি। আবার, যেখানে মুসলমানদের বৃদ্ধির এই সম্প্রদায়ের রাজ্য গড়ের তুলনায় কম, সেই জেলাগুলিতে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তৃতীয়তঃ পুরুলিয়ার মতো জেলাও রয়েছে যা সীমান্তবর্তী জেলা না হওয়া সত্ত্বেও এই জেলায় মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিজ নিজ রাজ্যের রাজ্য গড়ের তুলনায় বেশি। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্তে খুব সহজেই পৌঁছানো সম্ভব। প্রথমত: সীমান্তবর্তী জেলাগুলো অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে, এই বক্তব্যের কোন সারবত্তা নেই। কারণ এই জেলাগুলিতে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিকে কোন নির্দিষ্ট ছকে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত: ধার্মিক পরিচয়ের তুলনায় অন্য কয়েকটি সূচক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, যে জেলাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বৃদ্ধির হার রাজ্য গড়ের তুলনায় অনেকটা বেশি সেই জেলাগুলোতে স্বাক্ষরতার হার অন্য জেলাগুলোর তুলনায় অনেক কম। স্বাক্ষরতার নিরিখে উত্তর দিনাজপুরের স্থান সবার নিচে। তার ঠিক উপরেই

৮. ২০০১ ও ২০১১ সালের ধর্মভিত্তিক জনগণনার রিপোর্ট (পশ্চিম বংগের)

রয়েছে মালদা, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ। আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা জেলা যেমন, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী বা উত্তর ২৪ পরগনা উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নিজ নিজ রাজ্য গড়ের থেকে কম। স্বাক্ষরতার নিরিখে এই জেলাগুলির স্থান অনেক উপরে। কলকাতায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য এবং কলকাতার জন্মহার ভারতের ৬৪০টি জেলার মধ্যে বর্তমানে সর্বনিম্ন (১.২ সন্তান প্রতি দম্পতি)।[৯]

বলা যায়, ধর্মীয় সূচকের চাইতে সাম্প্রতিককালে মানুষের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পশ্চাদপদতা, ইত্যাদির অর্থনৈতিক ও পরিবেশিক বিষয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রশ্ন তোলা হয়, সে প্রশ্ন যদি, ধরা যাক যথার্থও হয়, তাহলে এর সাথে ধর্ম পরিচয় বিষয় নয়, মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পশ্চাদপদতার প্রশ্নই বেশি জড়িত। ভারতে মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থা বলা যায় উদ্বেগজনক। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে ১৭.৩% পরিবার নিরক্ষর এবং আরও ১১.৮% পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেনি। ৮০% মুসলমানদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় কায়িক শ্রম ও দিনমজুরির মাধ্যমে। মুসলমানদের মাত্র ১৭% মানুষ শহরে বসবাস করেন এবং ডাক্তারি, ওকালতি বা অধ্যাপকের পেশায় আছে মাত্র ০.৪% মুসলমান। এই অবস্থায় অন্য সুবিধাগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার জন্ম হার বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জন্মহার কমেছে (২০০১ থেকে ২০১১)।[১০] এই পরিসংখ্যান মুসলমানদের মর্মান্তিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

খোদ ভারতীয় মুসলমানদের এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ, কোটি মানুষ গিয়ে ভারতে বসতি গাড়বে, এরচেয়ে গাঁজাখুরি চিন্তা আর কিছু হতে পারে না। এমনকি বিজেপি, আরএসএস, বজরং প্রভৃতির মত ভারতে হিংসার চাষকারী দল নিয়ে যে সংঘ পরিবার গঠিত, তারা বলছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশি যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা অব্যাহতভাবে ভারতে বাস করেই চলছে (Bangladeshis have taken refuge in India, and continue to live here even 43 years after the Bangladesh war)[11]. এটা জঘন্য একটা মিথ্যাচার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তারা সকলে ১৯৭২ সালের শুরুতেই বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকেই এটা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের এক স্টেটমেন্ট-এ বলা হয়: মোট আশ্রয়প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩ শত ৫ জন। উক্ত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে যায় ৮৭ লাখ ৭ হাজার

---

৯. 'অনুপ্রবেশের তথ্য আসলে ধাপ্পাবাজি' শুভনীল চৌধুরী ও শাশ্বত ঘোষ (কলকাতায় ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর অর্থনীতির শিক্ষক)

১০. ২০১৪ সালে 'SNAP ও Guidance Guild' কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষা।

১১. 'Push-in Peril resurrected', The Weekly Holiday, December-2014

১৮ জন। অবশিষ্ট থাকে ১১ লাখ ৯২ হাজার ২৮৭ জন। আর এক তথ্যে জানা যায়, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া লোকদের সংখ্যা ৯১ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭৩ জন। অবশিষ্ট থাকে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৯৩২ জন। ১৯৭২ সালের ২ মার্চ ভারত সরকারের এক প্রেস নোটে জানা যায়, অবশিষ্ট আশ্রয় গ্রহণকারীরাও বাংলাদেশে ফিরে গেছে।[১২]

বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক হিন্দুদের ব্যবহার (কলকাতার দৈনিক আজকাল এ রঞ্জিত শুরের রিপোর্ট) করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের ‘সংঘ পরিবার’-এর ষড়যন্ত্রকারীরা বিকল্প হিসেবে ভারতের বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যের মুসলমানদের টার্গেট করেছে। তাদের একটি বড় অংশকে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী এবং বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ বসবাসকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে।

পশ্চিমবংগ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরার লক্ষ, কোটি বাংলা ভাষী ও অসমীয় ভারতীয় নাগরিক মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে, দিচ্ছে। সংঘ পরিবারের বজরং দল বলছে,

Oure organization’s agenda does not give any respite to Bangladeshis. As per government statistics, Their around three crore Bangladeshis in India. They must all leave. There is no question of them converting to Hinduism (if they leave India). Because of them, unemployment and crime rates have risen. They indulge in anti-national activities.... They have ration cards and voter IDs. Nothing will legalize their stay in India. They have to go.”[13]

অর্থাৎ “আমাদের সংগঠনের কাজ হল বাংলাদেশীদের নিঃশ্বাস ফেলার অবসর না দেয়া। প্রায় তিন কোটি বাংলাদেশি ভারতে আছে। তাদের ভারত ছাড়তে হবে। তারা চলে গেলে তাদের আর হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার দরকার হবে না। তারা ভারতে অপরাধ বাড়াচ্ছে, জাতিদ্রোহী কাজে জড়িত আছে তারা। তাদের রেশন কার্ড, তাদের আইডি কার্ড কিছুই তাদেরকে ভারতে বাস করার আইনি অধিকার দেবে না, তাদের চলে যেতেই হবে।”

এসব কথা একেবারেই গাঁজাখুরি, কিন্তু এর পরিষ্কার বার্তা হল বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের তারা বাংলাদেশী সাজিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দিতে চায়। তারা চায় বাংলাদেশের সাথে বিরোধ বাধাতে এবং বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে। তারা সম্ভব হলে বাংলাদেশকে সিকিম বানাতে চায়।

ভারতের উগ্রবাদী রাজনীতিবিদদের এই লক্ষ্য বলা যায় আমাদের স্বাধীনতার মতোই পুরানো। যে যে কারণে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে

১২. ‘India Bangladesh Relations’, Volume-V, Geetika Publishers, Naraina Vihar, New Delhi, Page. 2385, 2387.
১৩. ‘Push-in Peril resurrected’, Sadeq Khan, The Weekly Holiday, December-2014

এই মতলবও একটি ছিল। ভারতের প্রাচীন ও দায়িত্বশীল দৈনিক Statesman তার ‘Reunion of India’ প্রবন্ধে সে সময় লিখেছিল, ‘Now is the time to work for a united states of India with the merger of the country Bangladesh....[14]

কলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপের ইংরেজি দৈনিক ‘দি টেলিগ্রাফ’ তার একটা নিবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিল, ‘Bangladeshis are voting against Partition with their feet. নিবন্ধে বলা হয়েছিল, “ ...... তারা (বাংলাদেশী মুসলমানরা) ভারতের সাথে পুনর্মিলিত হচ্ছে। কারণ যখন তারা তাদের সন্তানের চোখ দিয়ে অবলোকন করেছে, দেখেছে ধ্বংস এবং জীবন বিনাশী হতাশা। তারা ভালোভাবেই বুঝে পাকিস্তান স্বপ্ন ছিলনা, ছিল আগুন বর্ষণকারী দানব। পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে ১৯৭১ সালে,.... দ্বিতীয়বার তারা প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ বিভাগকে। পাকিস্তান ছিল প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদ যা রূপ পেয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। এই দ্বিতীয় স্বপ্ন বাংলাদেশকেও তারা আজ প্রত্যাখ্যান করছে।[১৫]

ভারতের সংবাদপত্রগুলো যে মানসিকতা থেকে এই কথাগুলো লিখেছে, ভারতের রাজনীতিকরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র সম্পর্কে সেই একই মানসিকতা পোষণ করে। লক্ষ, কোটি বাংলাদেশীর ভারতে অনুপ্রবেশ, বসবাস এবং লক্ষ, কোটি বাংলা ভাষী ভারতীয়দের বাংলাদেশী সাজানোর মতো ভারতীয় উগ্রবাদী, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকদের ঘৃণ্য তৎপরতার মধ্যে এই মানসিকতারই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু তাদের কোন ষড়যন্ত্র এই এই পর্যন্ত সফল হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ সচেতন, সংগ্রামী এবং সব ষড়যন্ত্র, সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আপোষহীন। তাদের ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়াক, তাদের মোকাবিলায় বাংলাদেশিরা এক এবং ঐক্যবদ্ধ। ৪৬, ৫২, ৫৪, ৭১-এ তারা এটা দেখিয়েছে। অতি সম্প্রতি তারা তা দেখালো ২০২৪ -এর জুলাই বিপ্লবে। সবকিছুর মালিক আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি তাদের ভয় ও ভরসা নেই। তাদের এই সংগ্রাম ও সংগ্রামী চেতনার নেই ক্ষয়, নেই কোন পরাজয়। ■

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে ১৭.৩% পরিবার নিরক্ষর এবং আরও ১১.৮% পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেনি। ৮০% মুসলমানদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় কায়িক শ্রম ও দিনমজুরির মাধ্যমে। মুসলমানদের মাত্র ১৭% মানুষ শহরে বসবাস করেন এবং ডাক্তারি, ওকালতি বা অধ্যাপকের পেশায় আছে মাত্র ০.৪% মুসলমান।

১৪. ‘Reunion of India’, Statesman, , Vol. CXXIV, No. 258012
১৫. ‘The Telegraph, October 25, 1992

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহ.)

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইবন তাইমিয়ার সাথে সাক্ষাৎ ও অবস্থান

৭১২ হিজরীর শেষ দিকে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া মিশর থেকে দামিশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময়ই ইমাম ইবন তাইমিয়ার সংগে ইবনুল কায়্যিমের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন থেকেই তিনি ইবন তাইমিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করেন।[১] ইমাম ইবন তাইমিয়া ৭২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২] ইবন তাইমিয়ার সাক্ষাৎ লাভ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর ইবনুল কায়্যিম তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

বাকর বিন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাঁর সাথে এ দীর্ঘ ১৬ বছর অবস্থান করে প্রভূত জ্ঞান এবং বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।"[৩]

বিদ্যার্জনের জন্য সফর

একথা সুবিদিত যে, পূর্বকালের মনিষীগণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করতেন। কিন্তু ইবনুল কায়্যিম আল্ জাওযিয়ার জীবনীতে তেমনটি খুব একটা লক্ষ্য করা যায়না। তিনি শুধুমাত্র মিশরের কায়রো নগরীতে কয়েকবার সফর করেন।[৪]

বিদ্যার্জনের জন্য সফর না করার কারণ

সে সময়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি সংকলিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে দামিশ্‌ক নগরী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তখন এ নগরী ছিল বিদ্যানগণের আশ্রয়স্থল। বিভিন্ন স্থান থেকে 'উলামা ও ছাত্রগণ এখানে জ্ঞান চর্চার জন্য আগমন করতেন। এখানেই তদানিন্তন সময়ের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অবস্থিত ছিল এবং জগদ্‌বিখ্যাত পন্ডিৎগণেরও এটা ছিল বিচরণক্ষেত্র।

তাঁর পিতা তদানিন্তনকালের একজন সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত বিদ্যান এবং জাওযিয়া

---

১. ইবন কাছীর, প্রগুক্ত, খ. ১৪ পৃ. ২৩৪; সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, তারিখে দাওয়াত ওয়া 'আযিমত, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز); দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে ইবনুল কায়্যিমের শিষ্যত্ব গ্রহণের সন ৭১৩ হিজরী, ১৩১৩ খৃ. উল্লেখ করা হয়েছে। ভলি. ৩, পৃ. ৮২১। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ৭১২ হিজরীতে এবং তিনি তার পূর্ণ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ৭১৩ হিজরীতে।

২. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৩৫; ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز); ইবন হাজার 'আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪; দি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম ভলি. ৩, পৃ. ৯৫১। এতে ইংরেজী তারিখ ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৩২৮ খৃ. উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৪. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, হায়াতুহু ওয়া আছারুহু, পৃ. ৩২।

মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যার ফলে বড় বড় বিদ্যানগণ তাঁর নিকট আসত এবং তিনি তাদের বিষয়াদি তদারকি করতেন। বিশেষতঃ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া যেহেতু সে সময় দামিশ্‌কে অবস্থান করছিলেন, সেহেতু সংগত কারণেই দামিশ্‌ক ছিল সে সময়ের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রভূমি। আর এ কারণেই বিভিন্ন দেশ থেকে বিদ্যান ও ছাত্রগণ জ্ঞানার্জনের জন্য দামিশ্‌কে আগমন করতেন। সুতরাং সেখান থেকে ইবনুল কায়্যিমের জ্ঞানার্জনের জন্য অন্যত্র সফর করার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না।[৫]

বিভিন্ন বিষয়ে ইবনুল কায়্যিমের জ্ঞানের গভীরতা

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইবনুল কায়্যিম যেখানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং লালিত পালিত ও বড় হন, সেই দামিশ্‌ক-ই ছিল তদানিন্তন সময়ের জ্ঞান গবেষণার প্রাণ কেন্দ্র।

তিনি তাঁর পিতা, শিক্ষক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া ও সমসাময়িককালের জগদ্বিখ্যাত বিদ্যান ও পন্ডিতগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও জ্ঞান-গবেষণার ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শরী'আহ্ এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন।

প্রতিটি বিষয়েই তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসালামে তাঁর গভীর জ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

Ibn al kayyim's education was particularly wide and sound.

"ইবনুল কায়্যিমের শিক্ষা ছিল বিশেষভাবে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ।"[৬]

তাঁর জ্ঞান শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে ইবন কাছীর বলেন,

اشتغل بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والاصلين

"তিনি জ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন, বিশেষ করে তাফসীর, হাদীছ ও উসূল শাস্ত্রে।"[৭]

সায়্যিদ সাবিক বলেন,

واخذ العلم عن كثير من العلماء الاعلا م فى عصره وله فى كل فن انتاج قيم

"তিনি সমসাময়িক বিশ্বের অসংখ্য বিদ্যানের নিকট থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং প্রতিটি বিষয়েই তাঁর লব্ধ জ্ঞান ছিল সুদৃঢ়।"[৮]

বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যায়ন

জ্ঞান শিক্ষার প্রতি ইবনুল কায়্যিমের ঝোঁক প্রবণতা ও আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি দিবা-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি শরী'আহ ও অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়েই দক্ষতা অর্জন করেন। তাওহীদ ও কালাম শাস্ত্র, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, ফারায়িজ, 'আরবী

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
৬. The Encyclopaedia of Islam vol- 3, p. 821.
৭. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪।
৮. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز)

ভাষা, ব্যাকরণ, নীতি বিদ্যা, তাসাউফ এবং আরো অন্যান্য অনেক বিষয়েই তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতার ব্যাপারে বিভিন্ন মনিষীগণ যে সকল উক্তি করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

তাঁর অন্যতম ছাত্র ইবন রজব বলেন,

كان عارفا فى التفسير لا يجازى فيه وباصول الد ين واليه فيها المنتهي والحديث و معانيه و فقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذ لك وبالفقه واصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولي وعلم الكلام والنحو وغير ذالك وكان عالما بعلم السلوك وكلام اهل التصوف وله فى كل فن من هذه الفنون اليد الطولي

"তাফসীর শাস্ত্রে তিনি এতটাই বিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলনা। উসূলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন শেষ আশ্রয়স্থল। হাদীছ শাস্ত্র, হাদীছের মর্মার্থ ও তত্ত্ব এবং তা থেকে সুক্ষ্ম বিষয়াদি চয়নে তাঁর কোন জুড়ি ছিলনা। ফিক্‌হ, উসূলে ফিকহ, 'আরবী ভাষা, 'ইলমে কালাম ও নাহু শাস্ত্রে তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। তিনি নীতি বিদ্যা ও তাসাউফ শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর তার পূর্ণ দক্ষতা ছিল।"[৯]

সায়্যিদ সাবিক বলেন,

كان رحمه الله بحرا زاخرا بالوان العلوم والمعارف وكان مبرزا فى فقه الكتاب والسنة و اصول الدين و علم الكلام و علم السلوك و عبارة المتوصفين.

"তিনি ছিলেন নানামুখী জ্ঞানভান্ডারের সাগর। কুরআন, সুন্নাহ, উসূলে দ্বীন, 'আরবী ভাষা, কালাম ও নীতি শাস্ত্র এবং তাসাউফ শাস্ত্রের তিনি একজন অনন্য সমঝদার ছিলেন।"[১০]

দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

He was...well versed, like his master in all the main disepline of the time. Kuranic exegisis, hadith, usule fikh and furu.

"তিনি তার শিক্ষকের ন্যায় সমসাময়িককালের মৌলিক বিষয়সমূহে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি কুরআনের তাফসীর, হাদীছ, উসূলে ফিকহ ও ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন।"[১১]

বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ বলেন,

"তিনি অতিশয় বুদ্ধিমত্তা, প্রখর চিন্তা ও স্মরণশক্তি এবং আশ্চার্যজনক শক্তিমত্তার অধিকারী ছিলেন।"[১২]

ইবনুল কায়্যিম বিভিন্ন বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের মাযহাব সম্পর্কে অধ্যায়ন করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কোন বিষয়ে ইমামগণের মতামত ও মাযহাব কি এবং তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল কি, কুরআন হাদীছের আলোকে

---

৯. ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; যহীর আশ্ শাবীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
১০. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز) ও (ح)
১১. The Encyclopaedia of Islam, vol- 3, p. 821.
১২. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

কোন মতটি সঠিক, এ সকল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে ইবন হাজার 'আসকালানী বলেন,

كان واسع العلم عارفا بالخلاف و مذاهب السلف

"তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং পূর্ববর্তীদের মাযহাব ও মতভেদ সম্পর্কে সমধিক অবহিত ছিলেন।"[১৩]

'আল্লামা শওকানী বলেন,

"তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং সমকালীন যুগে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বময় খ্যাতি লাভ করেন এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের মাযহাবের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।"[১৪]

'আল্লামা যাহাবী বলেন,

"হাদীছের মতন এবং রাবীদের প্রতি ইবনুল কায়্যিমের প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি ফিক্‌হ্ শাস্ত্র অধ্যায়নে বিভোর থাকতেন এবং তার মাসয়ালাগুলো অত্যন্ত খোলাসা ও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতেন। নাহু শাস্ত্র শিক্ষাদান এবং উসূলে ফিকহ্ ও উসূলে হাদীছে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।"[১৫]

তিনি ছোট বেলা থেকেই বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন এবং আজীবন জ্ঞান সাধনাতেই লিপ্ত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে সায়্যিদ সাবিক বলেন,

وظل يخدم العلم الي ان توفي

"আমৃত্যু তিনি শিক্ষার খেদমতেই অতিবাহিত করেছেন।"[১৬]

মূলত: তিনি ছিলেন **اطلبوا العلم من المهد الى اللهد** "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর" এই কথার মূর্ত প্রতীক।

তাঁর শিক্ষক মন্ডলী

ইবনুল কায়্যিম তদানিন্তন কালের জগদ্বিখ্যাত বিদ্যানগণের সাহচার্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন এবং চিন্তা-চেতনায় এ সকল ব্যক্তির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। মূলত: তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও পরিপক্ক জ্ঞান লাভের মূলে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। নিম্নে তাঁর শিক্ষক মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল :

১. **তাঁর পিতা কায়্যিম আল জাওযিয়া :** পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন পিতা আবু বাকর ইবন আয়্যুব। পিতার নিকটেই তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয় এবং তাঁর নিকট থেকেই তিনি ফারায়িজ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ফারায়িজ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

২. **শিহাব আল 'আবির :** (মৃত্যু ৬৯৭ হিজরী)

৩. **আবুল ফাতাহ বা'লাবাক্কী :** (মৃত্যু ৭০৯ হিজরী)

---

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

১৬. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز)।

৪. **বিনত জাওহার :** (মৃত্যু৭১১ হিজরী)
৫. **কাজী সোলায়মান ইবন হামযা :** (মৃত্যু ৭১৫ হিজরী)
৬. **আস্‌সাফী আল হিন্দী :** (মৃত্যু ৭১৫ হিজরী)
৭. **ইবন মাকতুম :** (মৃত্যু ৭১৬ হিজরী)
৮. **আল্ মুতায়্যিম :** (মৃত্যু ৭১৯ হিজরী)
১০. **ইবন ‘আব্দুদ্ দায়্যিম :** (মৃত্যু ৭১৮ হিজরী)
১১. **শারফুদ্দীন ইবন তাইমিয়া :** (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী)
১২. **শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া :** তাঁর পূর্ণ নাম ছিল তাকিউদ্দীন আবুল ‘আব্বাস আহমাদ ইবন ‘আব্দুল হালীম ইবন ‘আব্দুস্ সালাম আন্‌নুমাইরী আল হারানী আল হাম্বলী। ১০ই রবি‘উল আউয়াল ৬৬১ হিজরী, ২২শে জানুয়ারী ১২৬৩ খৃ. সোমবার, হাররানে জন্ম গ্রহণ করেন।

৬৬৭ হিজরী (১২৬৯ খৃ.) তাকে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তিনি তাঁর পিতা ‘আব্দুল হালীমের সাথে দামিশকে প্রবাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। তিনি আবার জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ৭১২ হিজরীর শেষের দিকে পুণরায় দামিশ্‌ক আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন।

ইবন তাইমিয়া দামিশক পৌঁছার পর থেকেই ইবনুল কায়্যিম তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকের মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বৎসর তার সাহচার্যে জীবন অতিবাহিত করেন। ইবনুল কায়্যিম ইমাম ইবন তাইমিয়ার মূল সঙ্গীদের অন্যতম একজন ছিলেন। দীর্ঘ সাহচার্যকালে তাঁর নিকট থেকে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ফারায়িজ, উসূলে দ্বীন ও ‘ইলমে কালামের প্রভৃত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আল মুহাররার, আল মাহসুল, কিতাবুল আহকাম, আল আরবা‘ঈন, আল মুহসালসহ অনেক কিতাব তাকে পাঠ করে শুনান।

ইবনুল কায়্যিম স্বীয় শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার জিহাদের অন্যতম সহযোগী ছিলেন এবং শিক্ষকের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যথাযথভাবে তা পালন করেন। ৭২৮ হিজরীর ২০শে জিলকদ, ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৩২৮ খৃ. সোমবার রাত্রে এই মহাপুরুষ মৃত্যুবরণ করেন।

১৩. **আল মাজদুল হারানী :** (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী)
১৪. **যামলাকানী :** (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী)।
১৫. **আল কাহ্‌হাল :** (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)
১৬. **বাদরুদ্দীন :** (মৃত্যু ৭৩৩ হিজরী)
১৭. **আল মিয্‌যী :** (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী)
১৮. **ইবনুল মুফলিহ :** (মৃত্যু ৭৬৩ হিজরী)

এ সকল ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তদানিন্তনকালের জগদ্‌বিখ্যাত পন্ডিত। তাদের নিকট থেকে ইবনুল কায়্যিম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় পান্ডিত্য আর্জন করেন। জ্ঞান পিপাসু এই সাধক আজীবন জ্ঞান চর্চায় রত ছিলেন এবং শিক্ষাদান ও লেখনীর মাধ্যমে ‘ইলমের এমন এক স্থায়ী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গিয়েছেন, যার প্রভাব দুনিয়াব্যাপী এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

ইবনুল কায়্যিমের কর্মজীবন

ইবনুল কায়্যিম আজীবন জ্ঞান চর্চার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ জন্য তাঁর শিক্ষা জীবন থেকে কর্ম জীবনকে আলাদা করা খুবই কঠিন। তিনি জ্ঞান গবেষণা, ফাত্ওয়া দান, শিক্ষাদান ও বিভিন্ন বিষয়ে বই পুস্তক রচনাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক নিম্নে তুলে ধরা হল :

ফাত্ওয়া প্রদান : বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান বা ফাত্ওয়া প্রদান ছিল ইবনুল কায়্যিমের অন্যতম কাজ। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ মুজতাহিদ। চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সুক্ষ্মভাবে মাসয়ালা চয়নে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। নির্দিষ্ট কোন মাযহাব বা ইমামের তাকলীদ বা গতানুগতিক অনুকরণের পরিবর্তে তিনি সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে সঠিক বিষয় জানার চেষ্টা করতেন এবং তার আলোকে ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। ফলে মাযহাবী মতভেদপূর্ণ তদানিন্তন সমাজের অনেক 'আলিমের সাথে তার মতপার্থক্য সূচিত হয় এবং স্বীয় শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার মতই তাকে এক শ্রেণীর 'আলিমের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

মোনাজারা : মতভেদপূর্ণ বিষয়ে তিনি কুরআন-হাদীছের আলোকে যেটিকে সঠিক মনে করতেন, তার উপর অটল থাকতেন। সত্য ও সঠিক বিষয় সুস্পষ্ট হওয়ার পর তিনি সে বিষয়ে বিরোধীদের নিকট কখনো নতি স্বীকার করতেন না। ফলে সমসাময়িক 'আলিম ও ফকীহ্গণের সাথে ফিক্হের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার মোনাজারা হয়। বিশেষ করে সে সময়ের শাফি'ঈ মাযহাবের কাজী তাকিদ্দীন সুবকীর সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে মোনাজারা অনুষ্ঠিত হয়।

কারাবরণ

বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে তাঁর মতভেদের কারণে, বিশেষ করে সে সময়ের প্রধান বিচারপতি তাকিউদ্দীন সুবকীর সাথে দ্বন্দ্বের কারণে তাকে অনেক জুলুমের শিকার হতে হয় এবং কয়েকবার কারাবরণও করতে হয়। এ সম্পর্কে 'আব্দুর রাহমান ওয়াকিল, ইবন 'ইমাদ প্রভৃতি মনিষী বলেন,

وقد امتحن واوذى مرات و حبس مع الشيخ تقى الد ين في المرة الاخرة بالقلعة منفردا عنه ولم يفرج عنه الا بعد موت الشيخ

"তিনি অনেকবার পরীক্ষা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেষবারে তিনি স্বীয় শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার সঙ্গে একই জেলখানার পৃথক কামরায় বন্দী ছিলেন। শিক্ষকের মৃত্যুর পর তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন।"

সেবারেও তিনি দামিশ্কের সিটাডেল কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। ৭২৬ হিজরী, ১৩২৬ খৃ. থেকে ৭২৮ হিজরী, ১৩২৮ খৃ. পর্যন্ত তিনি শেষবারের মত কারাভোগ করেন।

এ ব্যাপারে দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বলা হয়েছে,

In 726/1326 1bn Al kayyim was imprisoned in the citadel at Damascus, at the same time as Ibn Taymiyya and was not released until 728/1328 after the latter's death,

"৭২৬ হিজরী (১৩২৬ খৃ.) ইবনুল কায়্যিম দামেশকের সিটাডেল কারাগারে বন্দী হন। একই সময় ইবন তাইমিয়াও বন্দী ছিলেন। তিনি ৭২৮ হিজরীতে (১৩২৮ খৃ.) শেষোক্তজনের (ইবন তাইমিয়ার) মৃত্যুর পূর্বে কারামুক্ত হননি।

কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি কুরআন অধ্যয়ন ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় মশগুল থাকতেন।

হজ্জ পালন : ৭৩১ হিজরী, ১৩৩১ খৃ. ইবনুল কায়্যিম মক্কায় গমন করেন এবং ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরো অনেকবার হজ্জ করেছেন এবং দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেছেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি 'ইবাদাতের কঠোর সাধনায় রত থাকতেন এবং খুব বেশী বেশী কা'বা ঘর তাওয়াফ করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ইবন রজব বর্ণনা করেন,

و حج مرة كثيرة وجا ور بمكة وكان اهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة و كثرة الطواف امرا يتعجب منه

"তিনি বহুবার হজ্জ করেছেন এবং মক্কায় অবস্থান করেছেন। তাঁর কঠোরভাবে 'ইবাদৎ পালন ও অতিমাত্রায় তাওয়াফকে মক্কাবাসীগণ একটি আশ্চর্যজনক বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।"

'ইবাদত-বন্দেগী ও কা'বা তাওয়াফ ছাড়াও মক্কায় অবস্থানকালে তিনি লেখার কার্যক্রমও চালিয়ে যান অব্যাহত গতিতে। "মিফ্তাহু দারিস্ সা'আদাহ" নামক গ্রন্থটি তিনি হজ্জের সময় মক্কায় অবস্থান কালে রচনা করেন। হজ্জের সময় তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। সেখানে কোন ডাক্তার বা ঔষধ ছিল না। তিনি রোগ মুক্তির জন্য মধু ও যমযমের পানি সেবন করে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

وقد جربت انا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبة واستشفيت به من عد ة امراض فبرأت باذن الله .

"আমি এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন যমযমের পানি সেবন করে আশ্চার্যজনক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। বেশ কিছু রোগের জন্য এ পানি সেবন করে আমি আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করলাম।"

ইমামতি : তিনি খতীব এবং ইমামতির দায়িত্বও পালন করেছেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতে তিনি জাওযিয়া মাদরাসার মসজিদেই ইমামতি করেন। এজন্যই ইবন কাছীর তাকে **امام الجوزية و ابن قيمها** "জাওযিয়ার ইমাম ও তার তত্ত্বাবধায়কের পুত্র" বলে উল্লেখ করেছেন।

৭৩৬ হিজরীর ২রা রজব, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নাজিমউদ্দিন খালিখান কতৃক নির্মিত একটি মসজিদে প্রথম খুত্বা প্রদান করেন। এই মসজিদটি দামিশ্কে অবস্থিত বাব সুরকী ও বাব তুমার বাইরে একটি বাগানে নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষকতা : বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা ইবনুল কায়্যিমের অন্যতম একটি পেশা ছিল। তার নিকট থেকে অনেক বড় বড় হাফিজ ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাফিজ ইবন রজব হাম্বলী, মুহাদ্দিছ যাহাবী, প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর ও ফকীহ হাফিজ 'আল্লামা ইবন কাছীর প্রমুখ।

তিনি কোন্ সময় থেকে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করেন, তার দিন তারিখ কোন জীবনী লেখকই উল্লেখ করেননি। তবে তার অন্যতম ছাত্র ইবন রজবের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ইবনুল কায়্যিম তাঁর শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার জীবদ্দশাতেই শিক্ষাদান শুরু করেন। ইবন রজব বলেন,

و اخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه

"শিক্ষকের জীবিতকালেই তাঁর নিকট থেকে বহু লোক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৭২৮ হিজরীতে ইবন তাইমিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় ইবনুল কায়্যিমের বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বৎসর। এ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, তিনি যৌবনের প্রথম দিকেই শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন।

কোথায় শিক্ষকতা করেছেন : ইবনুল কায়্যিম সাদরিয়া মাদ্‌রাসা ব্যতীত অন্য কোথাও শিক্ষকতা করেছেন কিনা, অথবা করে থাকলে কোথায় করেছেন, এ ব্যপারে কোনো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। হাফিজ সাখাবীর একটি বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে পাঠদান করতেন। তিনি বলেন,

وانتفع به الائمة ود رس باما كن

"তাঁর নিকট থেকে অনেক ইমাম শিক্ষালাভ করেছেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি স্থানে পাঠদান করেছেন।" সে সময় যেহেতু মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, বসতবাড়ী প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাদান করা হত, সেহেতু এমন হতে পারে যে, তিনি সাদরিয়া মাদরাসায় স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করেছেন এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি বিভিন্ন সময়ে দারস প্রদান ও পাঠদান করেছেন।

সাদরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা : 'আল্লামা ইবন কাছীর, ইবন রজব, আয-যাহাবী, ইবন হাজার 'আসকালানী প্রমুখ মনিষীর মতে ইবনুল কায়্যিম সাদরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন। ইবন কাছীর তাঁর শিক্ষকতার তারিখ ৭৪৩ হিজরীর ঘটনাবলীতে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন,

وفى يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الامام العلامة محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى امام الجوزية

"৬ই সফর, বৃহস্পতিবার আমাদের সঙ্গী, জাওযিয়ার ইমাম, 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর ইবন আয়্যুব আয্‌যুর'ঈ সাদরিয়া মাদরাসায় শিক্ষাদান শুরু করেন।" দি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে এ ব্যপারে বলা হয়েছে যে, On 6 safar 743/ 11 July, 1342 He gave his inougaral lecture at the sadriyya Madrasha, where He was to teach until His death

"৬ সফর ৭৪৩ হিজরী/ ১১ জুলাই ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি সাদরিয়া মাদরাসায় প্রথম বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।"

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ৭৪৩ হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাদ্‌রিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। (চলবে)

কালবের ব্যাধি ও তা দূরীকরণের গুরুত্ব

ড. আহমদ আলী

যেভাবে অসতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারণে মানুষের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে নাফসের প্ররোচনার অনুকরণের দরুন এবং মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুশীলন না করার কারণে মানুষের অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। কাফির ও মুনাফিকরা যেহেতু পুরোপুরিই নাফসের পূজারী ও স্বার্থান্ধ, তাই তাদের অন্তরসমূহ পুরোপুরি অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর প্রসঙ্গে বলেন, ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾–"তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে ব্যাধি।"[১] অর্থাৎ তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ। তবে একজন মু'মিনের নিকট ঈমানের একান্ত দাবি হলো, তার অন্তর পুরো সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হবে।[২] তবে তাদের যে কেউ যতটুকু পরিমাণ নাফসের প্ররোচনার অনুকরণ করবে এবং গুনাহে লিপ্ত হবে, তার অন্তর ততটুকু রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হবে।[৩] হাদীসে রয়েছে, কোনো মু'মিন যদি নাফসের তাড়নায় কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে তার কালবের ওপর একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর তার পাপের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেখানে একের পর এক দাগও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে এ দাগগুলো বাড়তে বাড়তে পুরো অন্তর ছেয়ে যায়। এর ফলে তার অন্তর অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে সে সত্য-ন্যায়-সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে অন্যায়-অসুন্দর ও মিথ্যার প্রতি তার ঝোঁক প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[৪] অর্থাৎ

---

১. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১০

২. কোরআনের ভাষায় এরূপ কালবকে ' قلب سليم ' (সুস্থ ও নীরোগ কালব) বলা হয়। দ্র. আল কোরআন, সূরা আশ-শু'আরা', ২৬: ৮৯; সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৮৪

৩. কোরআনে নারীলিপ্সু ব্যক্তির অন্তরকে রোগাক্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾-"..ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" (আল কোরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩২)
আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক [১১৮-১৮১হি.] (রাহ.) বলেন,
رأيتُ الذنوبَ تميتُ القلوبَ ** ويُتْبِعُها الذُّلَّ إدمَانُها.
وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ ** وخيرٌ لنفسكَ عصيانُها.
"আমি দেখছি যে, গুনাহগুলো অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলছে। বলাই বাহুল্য, গুনাহে নিমগ্নতা লাঞ্ছনা ডেকে আনে। আর গুনাহ-ত্যাগ অন্তরগুলোর জন্য প্রাণসদৃশ। অর্থাৎ এতে অন্তরগুলো প্রাণ ও সজীবতা ফিরে পায়। কাজেই তোমার নাফসের জন্য উত্তম ব্যবস্থা হলো- তুমি তার অবাধ্যতা করবে।" (ইবনুল মুবারাক, *দিওয়ান*, পৃ.২৬)

৪. আল কোরআন, সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩: ১৪

তারা গুনাহ করতে করতে তাদের অন্তরে গুনাহের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেয়। ফলে তারা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার উপলব্ধি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ/ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }.

মু’মিন/বান্দাহ যখন কোনো পাপ করে, তখন তার কালবের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অন্তর স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর যদি সে তাওবা না করে বরং আরো পাপ করে, তবে সে কালো দাগটি বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক পর্যায়ে তা তার পুরো অন্তরে ছেয়ে যায়। আর এটাই হলো ‘রাইন’, যা আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।[৫] “কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।”

‘আলী (রা.) বলেন,

الإِيمَانُ يَبْدَأُ نُقْطَةً بَيْضَاءَ فِي الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنِّفَاقُ يَبْدَأُ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ الْقَلْب .

ঈমান কালবের মধ্যে সাদা দাগ রূপে প্রতিভাত হয়। ঈমান বৃদ্ধির সাথে সাথে তার শুভ্রতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে পুরো অন্তর শুভ্রতায় পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নিফাক কালবের মধ্যে কালো দাগরূপে প্রতিভাত হয়। নিফাক বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্তরের কৃষ্ণবর্ণও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে পুরো অন্তর কালো দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে স্বত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! যদি তোমরা কোনো মু’মিনের কালব বিদীর্ণ করো, তা হলে তোমরা অবশ্যই তাঁর কালবকে সাদা দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কোনো মুনাফিকের কালব বিদীর্ণ করো, তা হলে তোমরা অবশ্যই তাঁর কালবকে কালো দেখতে পাবে।[৬]

---

৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব : তাফসীরুল কোরআন), হা. নং: ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৪৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৯৫২
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি হাসান। (আলবানী, *সাহীহু ও দা‘ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ.৭, পৃ. ৩৩৪)

৬. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, হা. নং: ৩০৯৫৭
ইমাম বাইহাকী (রাহ.) তাঁর ‘*শু‘আবুল ঈমান*’ (হা. নং: ৩৭) -এর মধ্যেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে **نُقْطَةً**–এর পরিবর্তে **لُمْظَةً** রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কালবে পাপের মরিচা জমতে জমতে একপর্যায়ে তা গাঢ় কালো আস্তরণে পরিণত হয়। পবিত্র কোরআনে এ অবস্থাকে 'খাতাম'[৭] (মোহর লাগা) বলা হয়েছে। কালব এ অবস্থায় পৌঁছে সত্য, ন্যায়, ঈমান ও ইসলামের প্রতি সব ধরনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং এ সব তাঁর কালবে প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা আর বাকী থাকে না। কোরআনের অন্য আয়াতে কালবের এ অবস্থাকে 'তাব'আ'[৮]ও বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, যাবতীয় কুকর্ম ও অসৎগুণ কালবের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কালবের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের কথা গ্রহণের যোগ্যতা পুরোটাই নিঃশেষ হয়ে যায়।[৯] স্মতর্ব্য যে, কাফির ও মুনাফিকের কালবে যে আস্তরণ জমে তা অত্যন্ত গাঢ় এবং কঠিন পাথরের সাথে তুলনা করা যায়। ফলে তাদের কালবের এ আস্তরণ কখনো অপসারণ হবার মতো থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾- "অতঃপর আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরগুলো পাথরের ন্যায় অথবা তারচেয়েও কঠিন হয়ে গেছে।"[১০] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফির-ইয়াহুদীদের অন্তরগুলোকে পাথরের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন, তাদের অন্তরগুলো পাথরের মতো বা পাথর অপেক্ষাও বেশি কঠিন।

অপরদিকে মু'মিনের অন্তরে যে আস্তরণ জমে তা হালকা হয় এবং তাকে আয়নার সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে হয়তো কিছুটা মরিচা পড়ে; তবে তা একটু ঘষামাজা করলেই স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে।[১১] কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি নিজে পাথরের আকৃতি ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর

---

৭. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৭

৮. আল কোরআন, সূরা আন-নিসা', ৪: ১৫৫; সূরা আন-নাহল, ১৬: ১০৮; সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৬

৯. এরূপ কালবকে কোরআনের ভাষায় ميت (মৃত অন্তর) বলা হয়। দ্র. কোরআন, সূরা আল-আন'আম, ৬: ১২২
সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ، وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ.- "ধ্বংস হয়ে গেছে সে ব্যক্তি, যার অন্তর ন্যায় চিনে না এবং অন্যায় প্রত্যাখ্যান করে না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্তর ন্যায়বোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্যায়ই তার অন্তরের প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সে প্রকৃতই ধ্বংস হয়ে গেছে। (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৮৬৬৪) এরূপ ব্যক্তি যদিও জীবিত; কিন্তু তার অন্তর প্রকৃতই মৃত। 'আসিম আল-আহওয়াল [মৃ. ১৪২ হি.] (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রা.) প্রায়ই নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করতেন,
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيِّتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.
''যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে স্বস্তি লাভ করলো সে প্রকৃত অর্থে মৃত নয়; প্রকৃত মৃত ব্যক্তি হলো জীবিতদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিই। অর্থাৎ যার অন্তর মৃত।"
এরপর তিনি বলতেন, صَدَقَ وَاللهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ حَيًّا وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.- "আল্লাহর কসম! কবি সত্য কথাই বলেছেন। সে যদিও জীবিতই হয়; কিন্তু বাস্‌ড়বে তার অন্তর মৃত।" (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*, [কালামুল হাসান আল-বাসরী রাহ.], হা. নং: ৩৬৩৬৭; বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান* [৪৭: মু'আলাজাতু কুল্লি যানবিন], হা. নং: ৬৯১৬)

১০. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৭৪

১১. বিশিষ্ট সূফী শাইখ 'আলী আল-হাজবিরী [৪০০-৪৬৫ হি.] (রাহ.) মু'মিনের অন্তরের এরূপ আস্তরণকে 'গাইনী হিজাব' নামে অভিহিত করেছেন। এর বিপরীত হলো 'রাইনী' হিজাব। 'গাইনী হিজাব' এক প্রকার সাময়িক হিজাব বা আস্তরণ। সামান্য চেষ্টা করলে এবং আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলে এ আস্তরণ দূরীভূত হয়ে যায়। এ জাতীয় আস্তরণ কম-বেশি সকলের মধ্যেই হয়ে থাকে। এটা দূর করার পদ্ধতি হলো, সরল অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। (গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ১৫)

করে আয়নাতে পরিণত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ -"যখন তারা নিজেরা বক্র পথ অনুসরণ করেছে, তখন আল্লাহও তাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিয়েছেন।"[১২] কেননা আল্লাহর এটা রীতি নয় যে, তিনি অন্যায় পথের পথিককে জবরদস্তি করে হিদায়াত দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾- "আল্লাহ তা'আলা যালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না।"[১৩] তবে যারা স্বেচ্ছায় ও সরল অন্তঃকরণে হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে চায়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াত দান করেন। তিনি বলেন, ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾-"আল্লাহ তা'আলা তাকেই সৎপথ প্রদর্শন করেন, যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে।"[১৪] তিনি আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

অতএব, যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং উত্তম বাণীকে সত্য বলে মেনে নেয়, আমি তাকে সুখের বিষয় (অর্থাৎ জান্নাত) লাভের পথ সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে, বে-পরওয়া হয়ে চলে এবং উত্তম বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয় (জাহান্নাম) লাভের জন্য পথ সহজ করে দেই।[১৫]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, যারা যে পথে তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম নিয়োজিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সে পথ সহজ করে দেবেন। কাজেই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে ভয় করে চলে এবং তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম সহজ করে দেবেন এবং এগুলো ক্রমে তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ -"হে মু'মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদেরকে ভালো-মন্দের পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ তাদের বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যে ভুল করে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, তাঁকে ভয় করে চলে না এবং তাঁর পথে সম্পদও ব্যয় করে না, তাদের বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিবেচনা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং এ কারণে তারা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে জাহান্নামের কাজকর্ম তাদের জন্য সহজ হয়ে যায় এবং এগুলোই ক্রমে তাদের মজ্জায় পরিণত হয়।

---

১২. আল কোরআন, সূরা আস-সাফ্ফ, ৬১: ৫
১৩. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৫৮
১৪. আল কোরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২: ১৩
১৫. আল কোরআন, সূরা আল-লাইল, ৯২: ৫-১০

উল্লেখ্য যে, মানুষের শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কালবের অধীন। তাই ইসলাম চায়, কালবের মরীচা দূর করে তাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

নিশ্চয় শরীরের মধ্যে গোশতের এমন একটি টুকরো রয়েছে, যা সংশোধিত হলে অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই সংশোধিত হয়। আর তা নষ্ট হলে অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই নষ্ট হয়। সাবধান! সেই টুকরোটি হলো কালব (অন্তর)।[১৬]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ.**-“অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দাহর ঈমান ঠিক হবে না এবং যবান ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অন্তর ঠিক হবে না।”[১৭]

কাজেই কালবকে সদা স্বচ্ছ, পবিত্র ও আলোকিত রাখা ইসলামের কাম্য এবং প্রত্যেক মুসলিমের ওপর তার ঈমানের একান্ত দাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাহর দেহাবয়ব ও ‘আকৃতির দিকে দৃষ্টি দেন না; তার কালবের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের আকৃতি ও তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও তোমাদের ‘আমালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।[১৮]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মানব জীবনের পরিশুদ্ধি একান্তই কালবের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। আর কালবের পরিশুদ্ধি ‘আমালের পরিশুদ্ধির ওপর

---

১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-ঈমান), হা. নং: ৫২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-মুসাকাত), হা. নং: ৪১৭৮

১৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৩০৪৮; কাদা‘ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং: ৮৮৭
হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে হাসান পর্যায়ের। (আলবানী, *সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ.. ২, পৃ. ৩৪৩, হা. নং: ২৫৫৪

১৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: আল-বির্র...), হা. নং: ৬৭০৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৮২৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৩৯৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪১৪৩
সর্বসাধারণকে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করতে দেখা যায়-
« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم »
“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের আকৃতির দিকেও দৃষ্টি দেবেন না এবং তোমাদের ‘আমালের দিকেও দৃষ্টি দেবেন না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেবেন।”
উল্লেখ্য যে, এরূপ রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ নয়। তদুপরি তা উপরে বর্ণিত সাহীহ হাদীসের পরিপন্থীও। ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেন, **فهذا لم يبلغنا من وجه يثبت مثله ، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح .**-“এ রূপ রিওয়ায়াত আমাদের নিকট কোনো সুদৃঢ় সূত্রে পৌঁছেনি। তা ছাড়া এর বক্তব্যও সাহীহ হাদীসের পরিপন্থী।” (বাইহাকী, *আল-আসমা’ ওয়াস-সিফাত*, হা. নং: ৯৫০, খ. ৩, পৃ. ৩৬)

নির্ভরশীল এবং 'আমালের পরিশুদ্ধি সর্বতোভাবে নাফসের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। অতএব, মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো, নাফসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত কর্ম থেকে বিরত থেকে কালবকে পরিচ্ছন্ন রাখা, অপরদিকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহ পালন করে কালবের ঔজ্জ্বল্য ও সুস্থতা বৃদ্ধি করা। শাইখ 'আবদুল কাদির 'ঈসা (রাহ.) বলেন, **فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية.** – "কালবকে পরিচ্ছন করা ও নাফসকে সংশোধন করা প্রত্যেকের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফারয ও আল্লাহর প্রদত্ত নির্দেশ।"[১৯] বলাই বাহুল্য, এ ধরনের সুস্থ কালব সম্পন্ন লোকেরাই আখিরাতে নাজাতপ্রাপ্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾–"যে দিন (অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন) কোনো অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তিই নাজাত পাবে, যে ব্যক্তি সুস্থ ও নীরোগ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছবে।"[২০] এ আয়াতে সুস্থ অন্তঃকরণ দ্বারা কুফর, শিরক, নিফাক ও বিভিন্ন আত্মিক কদর্যতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র অন্তঃকরণকেই বোঝানো হয়েছে।[২১] আর এরূপ অন্তঃকরণ কেবল সৎ ও একনিষ্ঠ মু'মিনেরই হতে পারে। কাফির, মুনাফিক ও পাপিষ্ঠদের অন্তঃকরণ মৃত, রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে থাকে।[২২]

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্ধায় মত্ত থাকা এবং অধিক মাত্রায় অর্থহীন কথাবার্তা ও বাজে কার্যকলাপে লিপ্ত হবার কারণে অনেক সময় মু'মিনের কালবও অত্যন্ত কঠিন ও গাফিল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পৌঁছে কালব আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে না, ওয়ায-নাসীহাতে নরম ও বিগলিত হয় না এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় চোখে অশ্রু আসে না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.

আল্লাহর যিকর ছাড়া অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথা বলার কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। (সাবধান!) আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী লোক হলো কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি।[২৩]

---

১৯. 'আবদুল জব্বার, *এলমে তাছাউফের হাকীকত*, পৃ.২৪

২০. আল কোরআন, ২৬ (সূরা আশ-শু'আরা'): ৮৯

২১. কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কোরআন*, খ.১৩, পৃ.১১৩-৪; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ.৬, পৃ.১৪৯

২২. বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহ.) বলেন, القلب السليم: هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض-"'কালবে সালীম' দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্থ অন্তঃকরণ। এটা মু'মিনেরই অন্তর। কেননা কাফির ও মুনাফিকের অন্তর রুগ্ন হয়ে থাকে।" (কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কোরআন*, খ. ১৩, পৃ. ১১৩-৪; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম*, খ. ৬, পৃ. ১৪৯)

২৩. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবঃ আয-যুহদ), হা. নংঃ ২৪১১

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্তরের কঠিনত্ব এমন এক মারাত্মক অবস্থা, যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ থেকে বঞ্চিত করে। বিশিষ্ট ‘আবিদ ফুদাইল ইবনু ‘ইয়াদ [১০৫-১৮৭ হি.] (রাহ.) বলেন,

خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ: الْقَسْوَةُ فِي الْقَلْبِ، وَجُمُودُ الْعَيْنِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ، والرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَطُولُ الْأَمَلِ.

পাঁচটি বিষয় দুর্ভাগ্যের নিদর্শন- অন্তরের কঠিনতা, চোখের জড়তা, লজ্জাস্বল্পতা, পার্থিব মোহ ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা।[২৪]

পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে কালবের এ অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন[২৫] এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ‘আমল করার নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। যেমন- গভীর চিন্তা-ভাবনাসহ কোরআন তিলাওয়াত করা, রাতে জেগে ‘ইবাদাত করা ও কান্নাকাটি করা, বেশি বেশি মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করা, হালকা ভোজন করা, অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, সৎ লোকদের সাথে মেলামেশা করা ও গরীব-অসহায় লোকদের সেবা করা প্রভৃতি। জনৈক কবি বলেন,

دَوَاءُ قَلْبِكَ خَمْسٌ عِنْدَ قَسْوَتِهِ ... فَدُمْ عَلَيهَا تَفُزْ بِالخَيْرِ وَالظَّفَرِ

خَلَاءُ بَطْنٍ وَقُرْآنٌ تَدَبَّرُهُ ... كَذَا تَضَرُّعُ بَاكٍ سَاعَةَ السَّحَرِ

كَذَا قِيَامُكَ جُنْحَ اللَّيلِ أَوْسَطَهُ ... وَأَن تُجَالِسَ أَهْلَ الخَيْرِ وَالخَبَرِ.

তোমার কালবের কঠিনত্বের পাঁচটি প্রতিষেধক রয়েছে। এ প্রতিষেধকগুলো নিরন্তর ব্যবহার করো, তবেই তুমি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। এগুলো হলো, পেট খালি রাখা (অর্থাৎ উদরপূর্তি করে পানাহার না করা), চিন্তা-ভাবনাসহ কোরআন তিলাওয়াত করা, রাতের শেষভাগে কাতরতার সাথে ক্রন্দন করা, রাত জেগে ‘ইবাদাত করা এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ও ‘আলিমগণের সাথে ওঠাবসা করা।[২৬] ■

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি দা‘ঈফ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা‘ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৪১১, হা. নং: ২৪১১)
উল্লেখ্য যে, হাদীসটির অনুরূপ বক্তব্য সাইয়িদুনা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম থেকেও বর্ণিত রয়েছে। (মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, হা. নং: ৩৬১৫)

২৪. বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, (৫৪: আল-হায়া’), হা. নং: ৭৩৫৪
বিশিষ্ট যাহিদ ও ফাকীহ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি‘ [মৃ. ১২৩ হি.] (রাহ.) থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, [৭১: আয-যুহ্‌দ], হা. নং:১০২৯৭)

২৫. যেমন সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و القسوة و الغفلة ...
‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে আল্লাহর নিকট দু‘আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য, কঠিনতা ও গাফলতি .... থেকে পানাহ চাই।” (হাকিম, *আল-মুস্তাতরাক*, কিতাব: আদ-দু‘আ, হা. নং: ১৯৪৪; তাবারানী, *আল-মু‘জামুস সাগীর*, হা. নং: ৩১৬ ও *আদ-দু‘আ*, হা. নং: ১৩৪৩)
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

২৬. ‘আবদুল হাদী, *ইসলাহুল কুলূব*, পৃ. ৬৫

হজ্জ ও নতুন জীবনের সূচনা

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও লাখ লাখ মুসলিম পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য মাক্কায় অবস্থান করছেন। হজ্জ কেবল একটি ফরজ ইবাদাতই নয়; বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক সফর, যার মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ রুহানি অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। মহানবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনরূপ পাপাচার ও অশ্লীল কাজের সম্পৃক্ততা ব্যতীত হজ্জ আদায় করলো, সে যেন এমন দিনের মত ফিরে আসল, যে দিন তাঁর মায়ের গর্ভ হতে তার জন্ম হয়েছিল।' এ হাদিসটিকে সাধারণত হজ্জের অত্যধিক ফজিলতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। এটি সত্য যে, মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হল গোনাহ মতে মুক্তি ও আখেরাতে জান্নাতপ্রাপ্তি। কিন্তু এ হাদীসে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, একজন ব্যক্তির হজ্জের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন এক নয়। হজ্জ তাকে একটি নতুন আধ্যাত্মিক জীবন উপহার দেয়, যা পূর্ববর্তী জীবন থেকে ভিন্ন, পাপমুক্ত ও অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ভরপুর।

আমরা এককালে এমন অনেক হাজী দেখতে পেতাম, যারা হজ্জের পর তাদের জীবন পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলতেন, পার্থিব জীবনের কোলাহল এড়িয়ে এবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে একদিকে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে হজ্জের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। দুর্নিবার দুনিয়াদারি ও পার্থিব ভোগবিলাসের এই যুগে হজ্জের আধ্যাত্মিক বার্তা খুব কম মানুষের হৃদয়েই প্রবেশ করছে। হজ্জের পরিবর্তনী বার্তা তাদের মর্মে প্রবেশ করতে পারছে না। হজ্জের প্রতিটি কাজ কীভাবে নবজীবনের পরশ বুলিয়ে পাপমুক্ত শুভ্র জীবনের বার্তা দিয়ে যায়, তা আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করব। ইহরাম দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক্।

ইহরামঃ পাপমুক্ত শুভ্র জীবনের অঙ্গীকার

অনেকে মনে করে, দুই প্রস্থ শুভ্র কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম। না, এটি ইহরামের অংশ মাত্র। তিনটি কাজের একত্রিত নাম হল ইহরামঃ প্রথমে দু'প্রস্থ সেলাইবিহীন কাপড় নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিধান করা। এ কাপড় সাধারণত সাদা-ই হয়ে থাকে। তারপর 'লাব্বাইকা উমরাতান' বা 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে হজ্জ বা উমরার নিয়ত করা ও তালবিয়া পড়া। এ তিনটি কাজ করলে ইহরাম সম্পন্ন হয়, তখন তাঁর ওপর কিছু বৈধ কাজ হারাম হয়ে যায়, তাই তাকে বলা হয় মুহরিম।

ইহরামের শুভ্র কাপড়ে নানাবিধ ইঙ্গিত রয়েছে, যেমন এতে সাম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুত ইসলামের বিধানগুলোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকে। যেমন- সালাতের কাতারে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা ও আশরাফ-আতরাফ সবাই এক সারিতে একই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ইবাদাত পালনে দণ্ডায়মান হয়। সিয়াম সাধনায় সকলে ক্ষুধার কষ্টে সমভাবে শরিক হয়। কিন্তু হজ্জের সাম্য আরো ব্যাপক। সকল হাজী একই উদ্দেশ্যে অভিন্ন

কাজ সম্পাদনের জন্য রওয়ানা করে, নানা স্থানে সমবেত হয়। সকলের পরনের শুভ্র কাপড় পরিপূর্ণ সাম্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

ইহরামের কাপড়ের শুভ্রতার সাথে আমরা যদি হাজরে আসওয়াদের আদি রূপের সংযোগ স্থাপন করি, তাহলে পাপমুক্ত জীবনের প্রেরণা গ্রহণ করতে পারি। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ আদম (আ)-এর সাথে জান্নাত হতে প্রেরিত হয়েছিল, তখন এটি ছিল দুধের মত সাদা; মানুষের পাপ শোষণ করে এটি কালো হয়ে যায়। এ হাদিস থেকে আমরা এমন বার্তা গ্রহণ করতে পারি যে, ইহরামের কাপড়ের শুভ্রতা নিষ্পাপতার প্রতীক। এ সাদা কাপড়টি যেন হাজিদের পাপমুক্ত জীবনের দিকে আহবান করে, পাশাপাশি এটিও বলে যে, পাপমুক্ত জীবনের জন্য কেবল হজ্জ সম্পাদন করাই যথেষ্ট নয়; বরং বাকি জীবনও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নয়ত পাপের কালিমায় হৃদয় আবারো কালো হয়ে যাবে, যেমন কালো হয়ে গেছে শুভ্র পাথর মানুষের পাপ শোষণ করতে করতে।

ইহরাম বাঁধার পর হাজীর জন্য কিছু কাজ হারাম হয়ে যায়, যেগুলো তাঁর জন্য স্বাভাবিক সময়ে বৈধ ছিল, যেমন নখ-চুল কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, গাছ কাটা বা ঘাস উপড়ানো এবং প্রাণী শিকার করা ইত্যাদি। এমনটি স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া পাপাচার, অশ্লীলতা ও ঝগড়া বিবাদের মত গর্হিত কাজগুলো হজ্জের সময় বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ইহরামের এ বিধানগুলোতে নানাবিধ প্রশিক্ষণ রয়েছে। তীব্র গরমের মাঝে কয়েকদিন ইহরামের পোশাকে অবস্থান করা, তাওয়াফ এবং আরাফা-মুযদালিফা ও মিনার যাত্রায় প্রচণ্ড ভিড়ে এবং ধাক্কাধাক্কিতে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সংযত আচরণ করা ও ঝগড়া-বিবাদ ও প্রতিবাদে লিপ্ত না হওয়ার মাঝে রয়েছে ধৈর্যের বিরাট প্রশিক্ষণ। তাছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়, তার প্রশিক্ষণও ইহরামের মাধ্যমে হয়ে যায়। ইহরাম অবস্থায় পাপাচার, অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা মুহরিমের জন্য পাপমুক্ত জীবন গড়ার প্রশিক্ষণ।

তালবিয়াঃ তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর আহ্বানে সাড়া প্রদান

ইহরামের পোশাক পরিধান করার পর হাজীগণ তালবিয়া পাঠ করেন: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা।' এ ঘোষণার মাধ্যমে হাজীগণ যেন ইবরাহীম (আ)-এর আহ্বানে সাড়া দেন, যিনি কয়েক হাজার বছর পূর্বে বায়তুল্লাহ নির্মাণ সম্পন্ন করে মানুষকে হজ্জের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তালবিয়ায় আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা ও নিয়ামতের স্বীকৃতি আছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তালবিয়ায় সবচেয়ে জোরালোভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় শির্কমুক্ত তাওহীদের: 'লা শারীকা লাকা বা আপনার কোন শরীক নেই', বাক্যটি তালবিয়ার শুরু ও শেষে উচ্চারণ করা হয়। এটি যেন মু'মিনের জীবনের সূচনা ও সমাপ্তির ইঙ্গিত। মুসলিম-গৃহে শিশুর জন্মের পর তার কানে আজান শোনানো হয়, যাতে রয়েছে তাওহীদের বাণী: 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' আবার মৃত্যু শয্যায়ও মু'মিনের কানে তাওহীদের কালিমার তালকিন দেওয়া হয়। তালবিয়ার সূচনা ও শেষে 'লা শারীকা লাকা' বাক্যটির উচ্চারণ যেন এই ঘোষণা দেয় যে, মু'মিনের পুরো জীবন হবে শির্কমুক্ত, যা

পাপমুক্ত জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্ত।

তাওয়াফ

মাক্কায় পৌঁছে হাজ্জযাত্রীর প্রথম কাজ হল আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তাওহীদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘর তথা বায়তুল্লাহর চারপাশে সাতবার তাওয়াফ করা। এর চারপাশে প্রদক্ষিণ আমাদেরকে এই বার্তাই দেয় যে, তাওহীদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে মু'মিনের জীবন। হজ্জে কমপক্ষে তিন দফা তাওয়াফ করতে হয়। তাছাড়া যতবার ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করা যেতে পারে। প্রতিটি তাওয়াফ মু'মিনের মনে তাওহীদের আহ্বান নবায়িত করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাওহীদী চেতনা-ই গোনাহমুক্ত জীবনযাপনের মূল ভিত্তি।

তাওয়াফে রয়েছে ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরাট প্রশিক্ষণ। তীব্র গরম ও প্রচণ্ড ভীড়ে তাওয়াফ করতে হয়। অনেক সময় ছাতার প্রান্ত কিংবা হুইল চেয়ারের চাকায় তাওয়াফকারী মৃদু আঘাত পায়, কিন্তু কোন বাদ-বিসংবাদ বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না, বরং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। হজ্জের এই অনুপম চর্চা ও শিক্ষা মাক্কায় রেখে আসার জন্য নয়, সারা জীবন চর্চা করার জন্যই, তাহলেই সম্ভব হবে পাপমুক্ত নতুন জীবন লাভ ।

বরকতময় জমজম দেয় পরিবর্তনের ছোঁয়া

তাওয়াফের পর হাজীরা জমজমের পানি পান করে। এই কূপের পানির বারাকাহ সম্পর্কে পাওয়া যায় অনেক উদ্ধৃতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠের ওপর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পানি হল জমজমের পানি, এতে আছে ক্ষুধার নিবারণ ও রোগের নিরাময় (তাবারানী)।' জমজমের পানিতে তৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি ক্ষুধাও যে দূর হয়, তা বহু মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ। আমাদের সৎকর্মশীল পূর্বসূরিগণ জমজমের পানির বারাকাহ লাভে দু'আ করতেন এবং তারা নানাভাবে উপকৃতও হয়েছেন। ইবন আব্বাস (রা) জমজমের পানি পানের সময় এই দু'আ করতেন, ' হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারি জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিকও সকল রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।' ইমাম শাফিঈ জমজমের পানি পান করে তিনটি বিষয়ে দু'আ করেছিলেন, হজ্জে ঠিকমত পাথর নিক্ষেপ করা, জ্ঞানার্জন ও জান্নাত লাভ। পরে তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে বলেছিলেন, তাঁর দু'টি দু'আ দুনিয়াতে কবুল হয়েছিলো। আরেকটি দু'আ আখিরাতে কবুল হবে বলে তিনি আশা করেন। জমজমের বারাকাহ হাজীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। তবে পরীক্ষা করার মানসে নয়, বরং বারাকাহ অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ণ আস্থার সাথে দু'আ করা উচিত। দু'আ কবুলের মালিক তো মহান আল্লাহ তা'আলা।

মিনা, 'আরাফা ও মুযদালিফায় ক্ষমা প্রার্থনা

৮ জিলহজ্জ হাজীগণ মিনায় গমণ করেন। সেখানে তারা ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। তালবিয়া, দু'আ ও ইসতেগফারে সময় কাটিয়ে দেন। এটিকে আরাফায় অবস্থানের প্রস্তুতি বলে গণ্য করা যায়, যেমন ফরজ সালাতের প্রস্তুতি হিসেবে নফল সালাত আদায় করা। পরদিন ৯ জিলহজ্জ হজ্জের সবচেয়ে বড় দিন। 'আরাফা ময়দানে অবস্থান হজ্জের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। মানুষ যেন বিশাল বিচারের প্রান্তরে আল্লাহ সামনে উপস্থিত। হাজীগণ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করেন। অতীতের পাপগুলো তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে: কেউ হয়ত সালাত তরক করার জন্য ক্ষমা চান, জীবনে আর সালাত কাজা না করার প্রতিজ্ঞা করেন। কেউবা মানুষের হক নষ্ট করার পাপ স্মরণ করে লজ্জিত হন, জীবনে সুদ, ঘুষ না খাওয়ার, অপরের হক নষ্ট না করার অঙ্গীকার করেন। আল্লাহর নিকট 'আরাফা দিবসের (৯ জিলহজ্জ) চেয়ে বেশি উত্তম দিবস আর নেই। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আকাশে নেমে এসে দুনিয়ার বাসিন্দাদের (অর্থাৎ হাজীদের) নিয়ে আকাশবাসীদের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দেখো, আমার বান্দারা ধূলিধুসরিত ও এলোমেলো অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে, আমার রহমতের প্রত্যাশায় তারা এসেছে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে, অথচ তারা আমার শাস্তি দেখেনি।' 'আরাফা দিবসের মত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আশা করা যায়, একনিষ্ঠভাবে তাওবাকারীরা আল্লাহর ক্ষমা লাভে ধন্য হবে। এভাবেই তারা অর্জন করেন পাপমুক্তির সৌভাগ্য।

'আরাফাতের পর হাজীগণ মুজদালিফায় অবস্থান নেন। আল্লাহ তা'আলা এখানেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন। সূরাতুল বাকারার **১৯৯** আয়াতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে, সেখান থেকে তোমরা ফিরে এসো (অর্থাৎ আরাফা থেকে মুজদালিফায় এসো), এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু ' আরাফা ময়দানে বিরাট ক্ষমার পর মুজদালিফায় এসে আবারো ক্ষমা প্রার্থনার আদেশের তাৎপর্য এই যে, হজ্জপালন ও ক্ষমাপ্রাপ্তি কোন অহংকার বা আত্মতৃপ্তির বিষয় নয়। বরং এটি একটি অব্যাহত চর্চার বিষয়। মহানবী (সা) নিষ্পাপ ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরপরও তিনি দৈনিক ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। 'আরাফায় অবস্থানের পর মুজদালিফায় এসে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ হতে বুঝা যায় হজ্জ-পরবর্তী নতুন জীবনে নেক কাজ ও পাপ বর্জনকে অব্যাহত চর্চায় পরিণত করতে হবে।

দশ জিলহজ্জ হাজীগণ মিনায় এসে জামারায় পাথর নিক্ষেপ করে। এই কাজের বাহ্যিক রূপে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে মানুষ বড় ভুল করে। কেউ কেউ জুতা নিক্ষেপ করে, কেউবা অতিরিক্ত জোরে পাথর মারে। এভাবে তারা পাথর নিক্ষেপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। প্রতীকী পিলারে পাথর নিক্ষেপের পাশাপাশি নিজের মনে বসবাসকারী ও কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানকে বিতাড়িত করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই জামারায় পার্থর নিক্ষেপের স্বার্থকতা পাওয়া যাবে।

হজ্জের প্রতিটি বিধানের বাহ্যিক দিকের পাশাপাশি একটি অন্তর্নিহিত বার্তা আছে, আমরা ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতে যার কিছুটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করা যায়, সম্মানিত হাজীগণ এসব তাৎপর্য উপলব্ধি করে হজ্জের শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করলে সদ্যোজাত শিশুর মত নিষ্পাপ জীবন অর্জন করতে পারবেন, যা পরকালে নিয়ে আসবে বিরাট সাফল্য। ■

লেখক : অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা

মীযানুল করীম

হরমুজ প্রণালী হলো, পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ও কৌশলগত জলপথ। এটি বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত জলপথ। হরমুজ প্রণালী, জিব্রালটার প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী, এডেন প্রণালী, সুয়েজ প্রণালীর মতোই ব্যস্ততম জলপথ। জিব্রালটার প্রণালী ভূ-মধ্য সাগরকে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পৃথক করেছে। মালাক্কা প্রণালী ভারত মহাসাগরকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পৃথক করেছে। এডেন প্রণালী ভারত মহাসাগরকে লোহিত মহাসাগর থেকে পৃথক করেছে। সুয়েজ প্রণালী লোহিত সাগরকে ভূ-মধ্যসাগর থেকে পৃথক করেছে। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের জলপথগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এর একপাশে ইরান, আরেক পাশে ওমান। ইরানের গুরুত্ব হরমুজ প্রণালীর কারণে। হরমুজ প্রণালীর আয় থেকে ইরান এবং ওমান ভাগ পায়। ইরানের অর্থনীতি হরমুজ প্রণালীর উপর নির্ভরশীল। এখন যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালীর উপর ভাগ বসাতে চায়। সে মনে করে, পরাশক্তির অধিকার রয়েছে হরমুজ প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করার। বৃটেন যা পারেনি আমেরিকা তাই করছে।

যুক্তরাষ্ট্র- ইরানের জাহাজ জব্দ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন: বিশ্ব শিপিং সংস্থাঃ

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার এবং একে অপরের জাহাজ জব্দের ঘটনাকে আন্তর্জাতির আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিপিং সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং' (আইসিএস)। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার এই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংস্থাটি অবিলম্বে আটক নাবিকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে।

আলজাজিরাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আইসিএসের মেরিন ডিরেক্টর জন স্টপার্ট বলেন, সমুদ্রপথে নাবিকদের কোনো প্রকার নিগ্রহ বা ভয়ভীতি ছাড়াই স্বাধীনভাবে চলাচল করতে দেয়া উচিত। স্টপার্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, নৌ-চলাচলের যে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা করা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি তার উপর এক চরম আঘাত।

বানিজ্যিক জাহাজগুলো কেবল পণ্য পরিবহনের কাজ করে, সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাধারণ নাবিকদের বন্দী বা জাহাজ জব্দ করার মতো ঘটনা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মূলত নিরপরাধ মানুষকে কারারুদ্ধ করার নামান্তর। বৈশ্বিক বানিজ্যিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে যা ঠেলে দিচ্ছে।

হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকারী জাহাজগুলোর উপর টোল আদায়ের যে ইচ্ছা পোষণ করছে ইরান, তার কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলেও উল্লেখ করেন স্টপার্ট। এই ধরনের পদক্ষেপ একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে। যদি হরমুজ প্রণালীতে টোল আদায় করা হয়, ভবিষ্যতে জিব্রালটার বা মালাক্কা প্রণালীতেও একই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দাবি ওঠার সুযোগ তৈরি হবে।

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায় ইরানি বন্দরগুলোতে নৌ-অবরোধ জারিরও কঠোর সমালোচনা করেছে শিপিং সংস্থাটি। তাদের মতে, একদিকে ইরানের পদক্ষেপের কারণে প্রণালীটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে, আর অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবরোধ নৌ-পরিবহন কোম্পানিগুলোর জন্য চরম অস্থিরতা তৈরি করেছে। এক দিকে হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকৃত জাহাজগুলো যেমন ইরানের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একই ধরনের পাল্টা পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন জানিয়েছে, তারা ভারত মহাসাগর থেকে ইরান- সংশ্লিষ্ট 'ম্যাজেস্টিক এক্স' নামক একটি জাহাজ জব্দ করেছে, যা মূলত নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা তেল পরিবহন করছিল। এর কয়েকদিন আগে তারা 'টিফানি' নামক আরো একটি জাহাজ আটক করে।

এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইরানের ইসলামিক রেভুলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) পানামার পতাকাবাহী 'এম এস সি ফ্রান্সেস্কা' এবং গ্রিসের মালিকাধীন এপামিন্ডাস' নামক জাহাজ দুটিকে জব্দ করেছে। তেহরানের দাবি, জাহাজ দুটি প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই চলাচল করছিল এবং তাদের নেভিগেশন সিস্টেমে কারচুপি করা হয়েছে। এই উত্তেজনার মাঝে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ নাবিকরা।

ফিলিপাইনের অভিবাসী শ্রমিক বিভাগ নিশ্চিত করেছে যে, ইরানি বাহিনীর হাতে আটক দু'টি জাহাজে ১৫ জন ফিলিপাইনো নাবিক রয়েছেন। যদিও ইরান দাবি করছে তারা সুরক্ষিত আছেন, কিন্তু আইসিএস মনে করে কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাদের আটক রাখাটাই মূল উদ্বেগের বিষয়। এ ছাড়া মন্টেনেগ্রোর চারজন নাবিকও ইরানি হেফাজতে রয়েছেন।

অন্যদিকে মার্কিন বাহিনীর হাতে আটক নাবিকদের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্টপার্ট জানান, হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় ২০ হাজার নাবিক পারস্য উপসাগরে আটকা পড়ে আছেন। দীর্ঘ দিন ধরে তারা এক প্রকার, 'গৃহবন্দী' অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক নেতিবাচক এভাব ফেলছে। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এখন আন্তর্জাতিক মহলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জে হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইসিএস যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষকে অবিলম্বে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

হরমুজ খুলতে আন্তর্জাতিক সহায়তা চায় যুক্তরাষ্ট্র:

হরমুজ প্রণালীতে নৌ চলাচল স্বাভাবিক করতে যুক্তরাষ্ট্র কিছু দেশকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠনের জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের এক তারবার্তায় এ কথা বলা হয়েছে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া যুদ্ধ দুই মাস পার হলেও বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ এখনো বন্ধ। যুদ্ধ শুরুর আগে এ পথ দিয়ে বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহ হতো। পরিস্থিতি থেকে বের হতে ইরানের তেল রপ্তানির উপর নৌ অবরোধ করে চাপ তৈরির চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

অন্যদিকে, ইরানকে আবার আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার কৌশল হিসেবে দেশটিতে নতুন করে হামলার পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্রিফিং করার কথা। মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে।

এই খবর প্রকাশের পর তেলের দাম আরও বেড়েছে। একপর্যায়ে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ১২৫ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

পেন্টাগনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এ পর্যন্ত ২ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার (২ লাখ ৯২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) খরচ হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই তারবার্তায় বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীকে আবার সচল করতে যুক্তরাষ্ট্র কিছু দেশকে নতুন আন্তর্জাতিক জোটে যোগ দেওয়ার আহবান জানাচ্ছে। মেরিটাইম ফ্রিডম কনস্ট্রাক্ট নামের প্রস্তাবিত এ জোট সহায়তা করবে।

কিছু দেশ এই জোটে অবদান রাখার বিষয়ে আলোচনা করেছে। তারা জানিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পরই তারা এই সহায়তা করতে আগ্রহী।

ইরান চায়, যুক্তরাষ্ট্র তাদের শান্তিপূর্ণ ও বেসামরিক উদ্দেশে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিক। ইরানের কাছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা প্রায় ৪৪০ কেজি ইউরেনিয়ামের মজুত রয়েছে। এসব ইউরেনিয়াম আরও সমৃদ্ধ করলে বেশ কয়েকটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব।

যুদ্ধ নিরসনে ইরানের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার করলে হরমুজে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করা হবে। একই সঙ্গে যুদ্ধও বন্ধ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে। ইরানের প্রস্তাব মার্কিনের চাওয়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। মার্কিন শুরুতেই পারমাণবিক প্রশ্নটির সমাধান চান।

একটি পাকিস্তানি সূত্র জানিয়েছে, ইরানের প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের 'পর্যবেক্ষণ' জানিয়েছে। এখন ইবানের উত্তর দেওয়ার পালা। সূত্রটি রয়টার্সকে বলেছে, 'ইরানিরা সময় চেয়েছে।'

হরমুজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ফাঁস

হরমুজ প্রণালীতে ইরানের সক্ষমতা ধ্বংস করতে পরিকল্পনা নিয়েছে মার্কিন সেনা বাহিনী। সিএনএন জানিয়েছে, হরমুজে ইরানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিতে নতুন সামরিক পরিকল্পনা করেছে পেন্টাগন। বৈশ্বিক রাজনীতি এখন চরম উত্তেজনার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি যুদ্ধবিরতি বাাড়ানোর ঘোষণার পরপর হামলার এসব কথা উঠে এসেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমেই।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে, পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ইরানের নৌ ক্ষমতা ও প্রণালীতে তাদের আধিপত্য খর্ব করতে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট 'টার্গেটিং' কৌশলের উপর জোর দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। মার্কিন সামরিক এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো তেহরানের সেসব সরঞ্জাম ধ্বংস করা, যা দিয়ে তারা এই আন্তর্জাতিক জলপথ কার্যত বন্ধ করে রেখেছে।

এর মধ্যে একটি পরিকল্পনায় হরমুজ প্রণালী, দক্ষিণ আরব উপসাগর এবং ওমান উপসাগরের আশপাশে ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, হরমুজ প্রণালীতে কেউ মাইন পাতলে মার্কিন নৌবাহিনী তাদের 'গুলি করে হত্যা করবে।'

পরিকল্পিত এই সামরিক অভিযানের তালিকায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ইরানের দ্রুতগামী আক্রমণকারী বোট, মাইন স্থাপনকারী জাহাজ এবং বিভিন্ন সমরাস্ত্র।

তেহরান বর্তমানে এই সম্পদগুলো ব্যবহার করেই হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণে রাখছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে।

মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, প্রণালীটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং এটি মূল্যস্ফীতি কমানোর প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ৭ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও সমুদ্রপথে এই অচলাবস্থা কাটেনি বলেই হামলার পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে। মার্কিন বাহিনী ইরানের মূল ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে বেশ কিছু হামলা চালালেও হরমুজ প্রণালীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এখনো অনেকটা অক্ষত। তার মধ্যে ইরানের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা মিসাইল এবং অসংখ্য ছোট ছোট বোট মার্কিন জাহাজের জন্য বড় হুমকি।

সিএনএনের প্রতিবেদনে জাহাজ চলাচলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঊর্ধ্বতন এক মধ্যস্থতাকারীসহ সামরিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন; শুধু বিচ্ছিন্ন হামলা চালিয়ে এই জলপথ অবিলম্বে উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানের সামরিক সক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ বাণিজ্যিক জাহাজগুলো এই পথ দিয়ে চলাচলের ঝুঁকি নিতে চাইবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কূটনৈতিক সমাধান না এলে তিনি ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোসহ দ্বৈত ব্যবহারের স্থাপনাগুলোতে হামলা চালানোর নির্দেশ দিতে পারেন।

হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থার প্রভাব:

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশের বেশি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন করা হয়ে থাকে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসারায়েলের হামলাকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে জাহাজ চলাচল বন্ধ। হরমুজ বন্ধ থাকায় জ্বালানি বিশ্বে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

শিল্প খাতের নির্বাহী এবং বিশ্লেষকদের মতে, পারস্য উপসাগর থেকে তেল ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব আগামীতে আরো প্রকট হবে। এর কারণ মজুদ থাকা জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে। মেরিটাইম ইন্টিলিজেন্স গ্রুপ কেপলার-জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়া ও হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার আগে প্রতিদিন যেখানে প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল সরবরাহ হতো, এপ্রিল মাসে তা দিনে ১০ লাখ ব্যারেলে নেমে এসেছে।

কেপলারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'যদিও জুন মাস থেকে পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হতে পারে, তবে বাজারের এই ভারসাম্যহীনতা কাটবে না। ফলে বিশ্ব তেলের বাজার

অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে এবং দেশগুলো মজুদ জ্বালানি ও চাহিদাকে সীমিত করার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।'

মাকিন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করা তেল খাতের একজন শীর্ষ নির্বাহী জানান, বাজারের উপর এই সঙ্কটের প্রভাব পড়েনি।

শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে এক্সনের সিইও বলেন, 'যদি এই প্রণালী বন্ধ থাকে, তবে সামনে আরো কঠিন সময় আসছে।' সিইও আরো জানান, যুদ্ধের মাঝে ট্রানজিটে থাকা তেলবাহী ট্যাংকার, বিভিন্ন সরকারের কৌশলগত মজুদ থেকে তেল ছাড় এবং বিদ্যমান মজুদ ব্যবহারের ফলে সরবরাহ সঙ্কট এতদিন সামাল দেয়া গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, সেই 'বাফার' বা আপদকালীন মজুদ এখন শেষ। মার্কিন এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, ২৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রল মজুদ ২২২ মিলিয়ন ব্যারেলে নেমে এসেছে, যা গত এক দশকের মধ্যে বছরের সর্বনিম্ন।

কেপলার এবং অন্যান্য শিপিং ডেটা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে হাতেগোনা কয়েকটি জাহাজ পারাপার হয়েছে। নৌবাহিনী জানিয়েছে, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল ৯০ ভাগ কমে গেছে। প্রতিদিন ১০ টিরও কম জাহাজ এই প্রণালী অতিক্রম করছে এবং প্রায় ২০ হাজার নাবিক পারস্য উপসাগরে আটকা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলাকে কেন্দ্র করে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ বন্ধ থাকায় জ্বালানি বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে তেহরানের উপর চাপ সৃষ্টিতে পারস্য উপসাগরে গত ১৩ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-অবরোধ আরোপ করে। যার ফলে ইরানের প্রধান বন্দর গুলোতে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তেল রফতানি মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান মার্কিন প্রশাসন বিশ্বকে শাসন করতে চায়। তারা বিশ্বকে শাসন করছে। মার্কিন প্রশাসন চায়, বিশ্ববাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে। ইরান যুদ্ধে তারা সেটা প্রমাণ করতে চেয়েছে। ইরানের সক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য এমন কোনো কাজ নাই যা করে নাই।

মার্কিন লক্ষ্যভেদ অনেক নিখুঁত। দূর থেকে মার্কিন প্রথম হামলাতেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনী নিহত হন, সাথে নিহত হন খামেনীর ছেলে, ছেলের বৌ, নাতী, প্রধান সেনাপতি, নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা। অথচ আলোচনার টেবিলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইরান প্রকৃত পক্ষে বাইরের কোনো সমর্থন পায় নাই। বরং আরব দেশগুলো বিরোধিতা করেছে। হরমুজ প্রণালী ইরানের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের জ্বালানি তেলের ২০শতাংশ তেল এই প্রণালী দিয়ে রফতানি হয়। ইরান কূটনৈতিক ভুল করছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। তাও দেখা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্র দূর থেকে এসে কর্তৃত্ব করছে কেন? ■

প্রশ্ন-১ ঃ প্রশ্ন কোনো ব্যক্তির সুদের টাকা মাসজিদের পায়খানা ও পেশাবখানা নির্মাণের কাজে লাগানো যাবে কি?

শামীম হায়দার, পটুয়াখালী

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তির সুদের টাকা কিংবা মাসজিদ ভান্ডারের টাকা ব্যাংকে রাখার ফলে যে সুদ এসেছে সে সুদের টাকা দিয়ে মাসজিদের পায়খানা ও প্রসাবখানার নির্মাণ কাজ করা জায়েজ হবে না। বরং এ টাকা সওয়াবের নিয়াত ছাড়া গরিব ও ফকির মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন-২ ঃ ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন অথচ মুক্তাদির এখনো তাশাহুদ পূরণ হয়নি। এমতাবস্থায় মুক্তাদি তাশাহুদ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে নাকি ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে? মুক্তাদী যদি ও দরুদ পড়ে সালাম ফিরায় তবে ওই মুক্তাদির নামাজে কোন সমস্যা হবে কি?

আবু আসলাম, যশোর

উত্তর ঃ এ অবস্থায় মুক্তাদির করণীয় হবে তাশাহুদ পূর্ণ করে ইমামের সাথে সালাম ফিরানো। কেননা ইমামের অনুকরণ করা মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব। অতএব মুক্তাদী দরূদ ও দোয়া মাসুরা পড়া বাদ দিয়ে তাশাহুদ পূর্ণ করে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। কেননা তাশাহুদ বাদ দেয়া বা না পড়া মাকরূহ তাহরীমী। অনুরূপভাবে দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়তে গিয়ে সালাম ফেরাতে বিলম্ব করা রুকূ' ও সিজদার তাসবীসমূহ পূর্ণ করতে গিয়ে ইমামের পিছে পড়া মাকরূহ তাহারীমী।

শারহুল মুনিয়্যা ও রাদ্দুল মুহতারে বলা হয়েছে, রুকূ' অথবা সাজদায় মুক্তাদির তিন তাসবীহ পাঠ করার আগেই যদি ইমাম রুকূ' অথবা সাজদা থেকে মাথা উঠান তখন মুক্তাদীগণের ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে রুকূ' অথবা সাজদা থেকে মাথা উঠাবেন। এর বিপরীত মাসালা হলো: মুক্তাদির তাশাহুদ পূর্ণ করার আগেই যদি ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেলেন অথবা তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান তখন মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ না করে তাশাহুদ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে অথবা তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে। তবে মুক্তাদী যদি তাশাহুদ পূর্ণ না করে অসমাপ্ত রেখে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে অথবা ইমামের সাথে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এটা জায়েয হবে। তবে মাকরুহ তাহরীমীর সাথে জায়েয হবে। আর মুক্তাদির দরুদ ও দু'আা মাসূরা পড়া অবস্থায় ইমাম যদি সালাম ফিরিয়ে ফেলেন তাহলে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করত: ইমামের সাথেই সালাম ফিরাবে। কেননা দরুদ ও দু'আ মাসূরা পড়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। ইমামের অনুসরণ করা যেহেতু ওয়াজিব, বিধায় ওয়াজিব পালনের তাগিদে সুন্নাত বাদ দেয়ার প্রয়োজন হলে তখন সুন্নত বাদ দিয়ে ওয়াজিব পালন করতে হবে। (দেখুন রাদ্দুল মুহতার (ফাতওয়া স্বামী, খ. ১, পৃ. ৪৬৩)

প্রশ্ন-৩ ঃ সৈয়দ আলী গোলাম রহমান এর কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে কোরআন মাজিদের উপর হাত রেখে এই কসম খেয়েছেন যে, আজ থেকে তুমি আমার ভাই নও এবং আমিও তোমার ভাই নই। জীবনে আমি যদি তোমার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখি তাহলে আমার যেন কাফেরের মৃত্যু হয়। এরপরে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কথায় সৈয়দ আলী ও গোলাম রহমান পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও ভ্রাতৃত্ব নবায়ন করতে চায়। এমন অবস্থায় সৈয়দ আলীর করণীয় কি?

মানসুরুল হক, হালিশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ প্রথম কথা হল, এ ধরনের কসম খাওয়া কখনোই ঠিক নয়। যে কোন ব্যক্তির এই ধরনের কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী। সৈয়দ আলীর কর্তব্য হবে অবিলম্বে কসম ভেঙ্গে ফেলা ও গোলাম রহমানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও নবায়ন করা এবং কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করা। আর কাফফারা হিসেবে দশ জন গরিব মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো, আল্লাহ সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য কাফফারা হচ্ছে ১০ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা সচরাচর তোমাদের নিজেদের পরিবার-পরিজনদের খাইয়ে থাকো। কিংবা তাদের পোশাক দান করো অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত কর। আর তা করার যার সামর্থ্য নেই সে তিন দিন সিয়াম পালন করবে। বস্তুত: এটাই হচ্ছে তোমাদের কাফফারা, যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলো। তোমরা নিজেদের কসমের হেফাজত করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আালা তার বিধানকে এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করেন। সম্ভবত: তোমরা শোকর আদায় করবে।" (সূরা আল মায়িদাহ : ৮৯)

সহীহ মুসলিমে এসেছে (হাদীসের অংশবিশেষ), 'আল্লাহর কসম' ইনশাআল্লাহ আমি যখন কসম করি এবং পরে তার বিপরীত জিনিস উত্তম মনে করি তখন আমি আমার কসমের কাফফারা আদায় করি এবং যা উত্তম সেটি করি।' (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কসম, হাদিস নং-৪২৬৩) এ হাদীসটি সহীহ আল বুখারীসহ হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৪ ঃ নাবী (সা) এর কবর জিয়ারতের জন্য সফর করার হুকুম কি?

ফজলে রাব্বী, যাত্রবাড়ি, ঢাকা

উত্তর ঃ কোনো স্থানের বা কোনো ব্যক্তির কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয নয়। কেননা নাবী (সা) বলেছেন, তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সফর করা যাবেনা : মাসজিদুল হারাম, আমার এ মাসজিদ (মাসজিদে নববী) এবং মাসজিদুল আকসা। এ হাদীছের উদ্দেশ্য হলো ইবাদাত বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে এ তিন মাসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও সফর করা যাবেনা। কারণ, হাদীছে উল্লেখিত তিন মাসজিদ ব্যতীত অন্যত্র

সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং নাবী (সা) এর কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা যাবেনা। বরং নাবী (সা) এর মাসজিদ (মাসজিদে নববী) এর উদ্দেশ্যে সফর করবে। যখন মাসজিদে নববীতে পৌছাবে তখন পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো নাবী (সা) এর কবর জিয়ারত করা।[1]

সুতরাং আমাদেরকে মাসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে সফর করতে হবে এবং সেখানে গিয়ে নাবী (সা) এর কবর জিয়ারত করতে হবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ কোনো ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় (ওযুর সময়) মুজার উপর মাসেহ করেছে, অত:পর সফরে বের হয়েছে। তাহলে সে কি উক্ত মাসেহ দ্বারা মুসাফিরের মাসেহ করার সময়কাল (তিন দিন) পূর্ণ করতে পারবে?

মোস্তাফিজুর রহমান, মৌলভী বাজার, সিলেট

উত্তর ঃ মুকীম অবস্থায় মুজার উপর মাসেহ করে অত:পর সফরে বের হলে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কথা হলো, সে মুসাফিরের মাসেহ করার সময়কাল (তিন দিন) পূর্ণ করতে পারবে। অপরদিকে অন্য একদল আলিমের মতে সে মুকিমের মুদ্দতই পূর্ণ করবে। (অত:পর ওযুর সময় মুজা খুলে বা ধৌত করবে) তবে প্রথম মতটিই অগ্রাধিকার যোগ্য।[2]

প্রশ্ন-৬ ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা (গায়েবানা জানাযা) পড়া শরী'আত সঙ্গত কিনা?

সফিকুল ইসলাম, দেবিদ্বার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ ইসলামী স্কলারগণ এ কথাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, গায়েব বা অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা (গায়েবানা জানাযা) শরী'আত সঙ্গত নয়। তবে যে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়নি তার গায়েবানা জানাযা পড়তে হবে। যেমন কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রে মারা গেল এবং কেউ তার জানাযা পড়ল না। অথবা পানিতে ডুবে মারা গেল অথবা হিংস্রপ্রাণী খেয়ে ফেলল এবং তার দেহ পাওয়া গেলনা। এ ধরনের মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া ওয়াজিব। সুতরাং তাদের গায়েবানা জানাযা পড়তে হবে। তবে যে ব্যক্তির জানাযার সালাত পড়া হয়েছে, সঠিক কথা হলো তার (গায়েবানা) জানাযা পড়া শরী'আত সঙ্গত নয়। কেননা নাজ্জাশী ছাড়া আর কারো গায়েবানা জানাযা পড়ার কোনো দলীল হাদীছে পাওয়া যায় না। নাবী (সা) মদিনায় নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছিলেন, কেননা তার দেশে তার জানাযা পড়া হয়নি। নাবী (সা) এর সময়ে (দূরবর্তি) অনেক বড় বড় ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ মারা গিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের (গায়েবানা) জানাযা পড়েছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়না।

কোনো কোনো আলিমের মতে ইসলামে যার আমলী, ইলমী বা আর্থিক বড় ধরনের অবদান রয়েছে তার গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে। যাদের ক্ষেত্রে দ্বীনের এরূপ কোনো কল্যাণ নেই তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না।

কোনো কোনো আলিমের মতে, সাধারণভাবে সকলেরই গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে। তবে এমতটি খুবই দুর্বল।[3]

---

1. মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উছাইমীন, ফাতওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃ. ১৬৭
2. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
3. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

প্রশ্ন-৭ ঃ জনৈক ব্যক্তি ঘরে জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করতে দাঁড়িয়েছে। ১০-১১ বছর বয়সের এক ছেলেকে সাথে নিয়ে। এতে কি জামা'আতের সওয়াব পাওয়া যাবে?

হারুনর রশিদ, কচুয়া, চাঁদপুর

উত্তর ঃ ইমামের সাথে ১০-১১ বছর বয়সের কোন নাবালেক শিশু যদি ইক্তিদা করে সালাত আদায় করে, তাহলে তাতে তাদের জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা হবে এবং এতে তারা জামা'আতের সওয়াবও পাবে।

(রাদ্দুল মুহতার : খ-১, পৃ. ৫১৭, আহসানুল ফাতাওয়া : খ-৩, পৃ. ২৯৮-২৯৯)

প্রশ্ন-৮ ঃ মুক্তাদি যদি একজন নাবালেক শিশু কিংবা একজন মহিলা হয় অথবা একজন শিশু ও একজন মহিলা হয় তাহলে কিভাবে দাঁড়াবে?

মাসুম বিল্লাহ, চান্দিনা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ মুক্তাদি যদি কেবল একজন নাবালক ছেলে হয় তাহলে সে ইমামের ডানপাশে দাঁড়াবে। আর যদি মুক্তাদী কেবল একজন মহিলা হয় তাহলে সে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। মুক্তাদি যদি একজন ছেলে শিশু ও একজন মহিলা হয় তাহলে শিশু দাঁড়াবে ইমামের ডান পাশে এবং মহিলা দাঁড়াবে ইমামের পিছনে।

প্রশ্ন-৯ ঃ একজন মেয়ের মা মারা গেছেন। বাবা অন্য মহিলাকে বিয়ে করে সংসার করছেন। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে একজন ব্যক্তি তার বাড়িতে নিয়ে লালন পালন করছেন। বর্তমানে যে পরিবারে আছে তারাই তার বাবা-মা। জন্ম নিবন্ধনে তারাই বাবা-মা হিসেবে স্বীকৃত। ভবিষ্যতে এই মেয়েটি তাদের সম্পদের ভাগীদার হতে পারবে কি?

সোহাইম চৌধুরী, ময়মনসিংহ।

উত্তর ঃ সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক যার ঔরসে তার জন্ম, তিনিই হবেন তার পিতা এবং যে মায়ের গর্ভে তার জন্ম তিনিই হবেন তার মাতা।

অতএব, কেউ লালন-পালন করলেই সে বা তারা তার মাতা ও পিতা হয়ে যান না এবং হতেও পারে না। ইসলামের সূচনা লগ্নেই এ প্রথাকে ইসলাম বাতিল ও রহিত করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ বাতিল ও কু-প্রথাকে মুসলমানরা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এর মাধ্যমে ইসলামের পর্দা বিধানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسط عِندَ الله ن فإن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু রূপে গণ্য হবে।" (সূরা আল-আহযাব-০৫)

যারা শিশুটিকে লালন পালন করছেন, তারা তার বাবা-মা নয় এবং হতেও পারবেন না বরং তারা দ্বীনি ভাই ও বোন হবেন। তারা শিশুটির বাবা-মা হিসেবে জন্ম-নিবন্ধন করে থাকলে সেটা তারা ভুল করেছেন। তাদের কর্তব্য হবে এ জন্ম নিবন্ধন বাতিল ও সংশোধন করে শিশুটির বাবা-মাকেই বাবা-মা হিসেবে জন্ম নিবন্ধন করা। শিশুটির বর্তমান বয়স যদি দুই বা আড়াই বছরের কম হয় এবং যে মহিলা লালন-পালন করছেন, তার কিংবা তার মায়ের

অথবা তার কোন বোনের দুধ পান করানোর যদি সুযোগ থাকে, তাহলে দুধ পান করিয়ে মেয়েটিকে আপন ও মাহারাম (যার সাথে বিবাহ হারাম) বানিয়ে নিজেদের দুধ মেয়ে ও দুধ সন্তান হিসেবে পরিবারে যতদিন খুশি রাখা যাবে। পর্দা জনিত কোন সমস্যা থাকবে না। মেয়েটির যদি দুধ পানের বয়স না থাকে, আরো বড় হয় এবং মেয়েটিকে যদি পুত্রবধূ বানানো সম্ভব হয় তাহলে তা করে পরিবারে রাখতে পারবেন। অন্যথায় মেয়েটির পর্দা করার বয়স হয়ে গেলে তাকে পরিবারে রাখতে হলে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষ সদস্যের তার সাথে পর্দা করা ফরয হবে। অন্যথায় ফরয লঙ্ঘনের কবীরা গুনাহ প্রতিনিয়ত হতে থাকবে। এছাড়া আরও বড় বড় পাপের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইসলামের সূচনা যুগেই ইসলাম পালক পুত্র-কন্যা বানানোর প্রথাকে রহিত ও বাতিল করে দিয়েছে। অতএব মুসলমানদের এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। পালক পুত্র-কন্যা লালন পালনকারীদের সন্তান নয়। অতএব, পালক পুত্র-কন্যা আইনগতভাবে লালন পালনকারীদের সম্পদের ওয়ারিশ বা ভাগিদার হবে না। অবশ্য কেউ যদি এহসান করে তাকে কিছু দান করে, তাহলে সেটা হবে তাদের নিছক ইহসান ও দান।

- ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

এখানে আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে